১০ম বর্ষ]　　আষাঢ়, ১৩৪৫　　[৯ম সংখ্যা

বঙ্কিম-প্রতিভা

১। লোকশিক্ষা

"নিষ্প্রভ কেন চন্দ্রতপন,
স্তম্ভিত মৃদু গন্ধবহন,
ধীব তটিনী মন্দগমন,
স্তব্ধ সকল পাখী ?
বঙ্কিম তব লাগি।"

চুয়াল্লিশ বৎসব আগে যখন বঙ্কিমচন্দ্র অমবধামে চলিয়া গেলেন, তখন রাজশাহী শহরে শোক-সভায় যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহার প্রথম ছত্রটি এই। ইহাকে কি প্রাচ্য জাতির অতিবঞ্জিত ভাষা বলিব ? বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ভাবিলে, এবং তাঁহার তিবোধানের পব বাঙ্গলা সাহিত্যেব অবস্থা মনে কবিলে এ কথা মিথ্যা বলা যায় না। আজিকার এই নভেলের একাধিপত্যের দিনে আমবা বঙ্কিমকে সম্পূর্ণরূপে

চিনি না, তাঁহার অসংখ্য দিকে মহত্ত্বের দুটি একটি মাত্র স্মরণ করি। বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু অদ্বিতীয় প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহা নহে। সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং চারি দিক ব্যাপিয়া পড়াশুনা ছিল। তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রাজুয়েট ছিলেন, সে আজ আশি বৎসর হইল। আমি প্রাচীনদের কাছে শুনিয়াছি যে, সেই যুগে ভাল ছেলেরা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক মাত্র পড়িয়া ক্ষান্ত থাকিত না, তাহাদের লাইব্রেরিকে লাইব্রেরি পড়িয়া শেষ করিতে হইত, "সিনিয়ার 'আশুবাবু" এবং ি. কে. লাহিড়ী ইহাব জলন্ত দৃষ্টান্ত।

গল্প-রচয়িতা, গীতার মর্ম্ম-প্রকাশক, বসিক সমালোচক—এই সব বা িয়াই বঙ্কিম আজকাল আমাদের কাছে পবিচিত, কিন্তু ইতিহাসেও তাঁহার আগ্রহ ছিল বিদ্যাসাগরের মত। বিদেশী দর্শনে তাঁহার গভীর জ্ঞান, তাঁহাব ধর্ম্মসম্বন্ধীয গ্রন্থগুলিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আবও কত দিকে তাঁহাব মন ঘুবিত, তিনি কত বিভিন্ন বিভাগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি পডিতেন, নূতন নূতন বিলাতী চিন্তার সহিত পবিচয় রাখিতেন এবং দেশবাসীদের, বঙ্গভাষাভাষীদেব সেই সব জ্ঞানেব সারাংশ উপহার দিতেন, তাহা তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' না পডিলে বুঝা যায় না। বঙ্কিম-প্রতিভাব এই দিক্‌টা আজকাল আমবা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি।

১২৭৯ সালের বৈশাখে 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিম লেখেন ঃ—

"ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আ ার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে [ইংরাজি] আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান, এবং বাঙ্গালিরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন।

"যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির সম্ভাবনা নাই।·· যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে?

"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।···বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।"

সুতরাং বঙ্কিম স্বয়ং এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া জ্ঞানের নানা বিভাগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সারাংশ, এবং বিদেশের নবীনতম চিন্তার আভাস বাঙ্গালী পাঠকদের—বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণের—সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত শেষ পত্রিকার নাম 'প্রচার' ছিল, যদিও তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অনেক ছিল—এবং এজন্য উপন্যাস-প্রিয় পাঠকেরা বঙ্কিমের নিকট নালিশ করেন—তথাপি ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজী-অনভিজ্ঞের নিকট নূতন নূতন চিন্তা ও উচ্চ ভাব প্রচার করা। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় চারি বর্ষ ধরিয়া এই জ্ঞান প্রচারের কাজ করিয়াছিলেন, তাহা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প ও কবিতার সাহায্যে। এই লোকশিক্ষার কাজে বঙ্কিম যে শ্রম করিয়াছিলেন, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তাঁহার এই 'বিবিধ প্রবন্ধ'গুলি যেন সর্ব্বত্র আদৃত হইতে থাকে। সময়ের গতিতে তাহাদের মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি বা নাম বা তথ্য পুরাতন ও বাতিল হইয়াছে, কিন্তু চিন্তার মূল্য কমে নাই, এখনও এগুলি দেশকে শিখাইতে পারে।

২। ভাষা

তাঁহার দেবদত্ত প্রতিভার ক্রমবিকাশের আর এক দিক দেখা যায় তাঁহার ভাষার আলোচনা করিলে। এখানে তাঁহার প্রথমকার ছোট রচনা, ঈশ্বর গুপ্তের স্কুলে হাতে খড়ির ফলগুলি, বাদ দিলাম।

বঙ্কিমের প্রথমকার গদ্যে আছে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য—সংস্কৃত ভাষার প্রভাব তখনও বাঙ্গলা সাধু ভাষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি তাঁহার এই রচনাগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। কিন্তু সাধারণ লোকের, বিশেষতঃ স্ত্রী-চরিত্রের কথাবার্ত্তায় নহে,—তাহা প্রথম হইতেই স্বাভাবিক ছিল; পরে বঙ্কিমের ভাষা অনেক নরম, অনেক সহজ হইল, লৌহ-বর্ম্মের দৃঢ়তা ছাড়িয়া দিয়া রক্তমাংসে গঠিত জীবন্ত মানব-দেহের স্বাভাবিক স্পন্দন, ভাবের প্রতি আঘাতে হিল্লোল তাঁহার শব্দের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইল। অথচ কখনও ঠিক বীরবলী ভাষায় পরিণত হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত সংযম, অভিজাতের উচিত আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

বিদ্যাদিগ্‌গজের কথাবার্ত্তার সহিত 'সীতারামে'র রাজ্যধ্বংসের ঐতিহাসিকযুগল আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদ যে ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে খাইতে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের গভীর গবেষণা করিতে-ছিলেন তাহার ভাষা তুলনা করুন।

আমাদের হাস্যরস-পরিপূর্ণ শুভ্রকেশ প্রবীণ সাহিত্যিক কেদারবাবু প্রথম বয়সে বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গলা রচনা সম্বন্ধে যে মহামূল্য উপদেশ পান, তাহা হইতে ভাষা ও লেখার ধরণ কিরূপ হইলে বৃদ্ধ বঙ্কিমের মনঃপূত হইত তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কেদারবাবু তখন যুবক, এক দিন বঙ্কিমকে ধরিবার জন্য বালি স্টেশনে আড়ি পাতিয়া আছেন। বঙ্কিম

সেদিন ট্রেন ফেল করিয়া প্লাটফর্মে পাইচারি করিতেছিলেন। কেদার-বাবু প্রণামানন্তর সাহিত্যরচনা সম্বন্ধে উপদেশ চাহিলেন। সাহিত্যসম্রাট্ উত্তর করিলেন, "ও ইচ্ছা যদি থাকে, খুব পড়ো, পুঁজি বাড়াও, এর পর বিতরণ সহজ হবে। Spectator পড়েছ কি? এডিসন, ষ্টীল, সুইফ্ট এঁদের লেখা দেখো, ভাল ক'রে দেখো। সত্যকার জীবন দেখা চাই। যা জানো, বোঝো—তাই লিখো। লেখা বাড়াবার জন্যে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে লিখো না। এক কাজ ক'রো,—নিজের গ্রামের আর আশপাশের পরিচয়—গল্প হোক, কাহিনী হোক, যতটা পার সংগ্রহ ক'রে, লেখবার চেষ্টা ক'রো। আগে সেইটে ক'রো দিকি··· দুর্বোধ্য ভাষায় লিখতে যেও না, বৃথা শ্রম হবে, নিজের উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে, কাজে লাগবে না। ষ্টাইল? ষ্টাইল শেখাতে হয় না।—যা নিজের হ'য়ে দেখা দেবে, তাই তোমার ষ্টাইল, অন্যের মত ক'রে লিখতে যেও না, তাতে দু-কূল যাবে,—আমাদের সাহেব হবার মত। ··ভাল শোনাবে ব'লে বেশী বিশেষণ ব্যবহার ক'রো না, ঠিক বাছাই চাই, একটিই যথেষ্ট।"

৩। চরিত্র অঙ্কন ও বিশ্লেষণ

তরুণদের দল হইতে একটা সমালোচনা শুনিয়া আসিতেছি যে, বঙ্কিম সুন্দর রোমান্স লিখিতেন মাত্র, তাঁহার মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানটা আদৌ গভীর ছিল না, তিনি চরিত্র-বিশ্লেষণে অপারক, অথবা অত্যন্ত কাঁচা ছিলেন, আজকালকার কয়েকটি (এমিল্ জোলার ছাত্র?) বাঙ্গালী ছাইকো-এনালিস্ট ঔপন্যাসিকের কাছে আর বঙ্কিম বা

"হেম-নবীনের নাইকো জারিজুরী"।—(ইতি হেমচন্দ্রঃ)

এরূপ কথা স্যর্ ওয়াণ্টার স্কটের বিরুদ্ধেও শুনা গিয়াছে, তাঁহার সহিত তাঁহারই সমসাময়িক লেখিকা জেন অস্টেনের তুলনা করিয়া এই পার্থক্য প্রমাণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাব আর একটা দিক্‌ও দেখা উচিত। স্কটের উপন্যাসগুলি ঘটনাবহুল, বড় বড় ঘটনায় ভরা; ওয়েভার্লি নভেলের অনেকগুলিতেই চরিত্রগুলি নানা স্থানে, দূর দেশে, বা ইংলণ্ড-স্কটলণ্ডেব সুদূর অতীত কালে ঘুরিতেছে; তিনি ঘটনাচক্রে নানা শ্রেণীর লোককে পাঠকের সম্মুখে আনিতেছেন। কখন রাজসভা, কখন যুদ্ধক্ষেত্র, কখন সম্ভ্রান্ত সামন্তের হর্ম্ম্য, কখন ধর্ম্মের মঠ বা ডাকাইতের আড্ডা তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির অভিনয়ের পৃষ্ঠপট। আব জেন্ অস্টেনের নায়ক-নায়িকারা যেন একটি গ্রামের একটি ঘরের লোক; অসংখ্য ছোট ছোট দৈনন্দিন ঘটনার সাহায্যে, অত্যন্ত ফিকে রং তুলিতে লইয়া, লেখিকা সেই নর-নারীদের অন্তরের ছবি আঁকেন, অনেক কাল ধরিয়া তুলির পোঁচেব পর পোঁচ জমিয়া তবে ঐসব চরিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমরা অবশেষে তাহাতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ('অভিব্যক্তি' বলিব কি?) দেখিতে পাই, যাহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে অথচ প্রথম প্রথম পাঠকেব চোখে ধরা পড়ে নাই। ইহাই চরিত্র-বিশ্লেষণ-শিল্পী ঔপন্যাসিকের প্রণালী। এগুলিব মধ্যে কাজ অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বড় কম ঘটিতেছে,—সবই যেন সাধারণ, নিত্য-নৈমিত্তিক সংসারের জিনিস, অথচ একঘেয়ে নয়, শেষে ভাবিলে অবহেলার জিনিস নয়, ইহাই এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর চালাকি। অর্থাৎ তাঁহারা অণুবীক্ষণ মাত্র ব্যবহার করেন, এবং তাহাও বহুক্ষণ ধরিয়া অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত, কিন্তু সরু ছোট ছুরি দিয়া ঐ যে হৃৎপিণ্ডটা অসংখ্য বার কাটিয়া দেখিলেন, তাহার পরীক্ষার ফলগুলি আশ্চর্য্য দক্ষতা ও সৌন্দর্য্যের সহিত সমবেত ও সামঞ্জস্য করিয়া একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র গড়িয়া তুলিলেন—

যেমন সাত হাজার খণ্ড খণ্ড পৃথক অংশ একত্র মিলাইয়া জোড়া দিলে তবে একখানি এয়ারোপ্লেন সম্পূর্ণ হয়—ইংরেজী সাহিত্যে জেন অস্টেনের পর ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত জর্জ এলিয়ট—এবং (দ্বিতীয় শ্রেণীতে) মিসেস্ হাম্‌ফ্রে ওয়ার্ড। এ দেশে, 'ঘরে বাইরে,' 'চোখের বালি' 'গোরা'। রবীন্দ্রনাথ যে 'হেম-নবীন-বঙ্কিমে'র দলের নহেন—এক জন আদর্শ সাইকো-এনালিস্ট, তাহা বলিতে হইবে না।

বঙ্কিম কি এরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে সত্যই অপারক ছিলেন? তাঁহার মস্তিষ্ক কি এদিকে একেবারেই খেলিতে পারিত না, অথবা তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঘটনাবহুল, দ্রুতগামী, রোমাণ্টিক উপন্যাস লেখেন? তাঁহার দুই তিনখানি বই লইয়া দেখা যাউক। বঙ্কিম প্রায় সকল গল্পের মধ্যেই এমন দুইটি জিনিস দিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ দিতে পারে না, যাহা বঙ্কিম ভিন্ন আর কেহ এত সুন্দর করিয়া দিতে পারিতেন না। একটি বাঙ্গালী অন্তঃপুরের দৃশ্য, অপরটি বুদ্ধিমতী দৃঢ়চরিত্র বাঙ্গালী স্ত্রীর দৃষ্টান্ত। সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বঙ্কিমের প্রায় সব গ্রন্থেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকগুলির চরিত্র বেশি সবল, বেশি জীবন্ত, বেশি বিশেষত্বগুণে ভূষিত। আমরা তাঁহার নায়কদের অনেক আগে ভুলিব; কিন্তু তাঁহার নায়িকাগুলি পাঠকের মনে যে ছাপ দিয়া গিয়াছে, তাহা কখনও মুছিবে না।

এখন তাঁহাব তিনটি এক ধরণের নায়িকাকে পাশাপাশি খাড়া করিয়া দেখা যাউক, তিনি তাহাদের মধ্যে সুকৌশলে ধীরে ধীরে পার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন, না তাহাদের এক ছাঁচে ঢালিয়াছেন। এ তিনটি—শান্তি প্রফুল্ল এবং শ্রী।

তিন জনই অনুপমা সুন্দবী, আবার তাহাদের "বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর" ('দেবী চৌধুরাণী', ১-১৪)। তিন

জনই অতি দরিদ্রের কন্যা, পিতৃহীনা অসহায়া, অল্পবয়সে বিবাহিতা, কিন্তু (শান্তিব দেশে ফিরিয়া ননদ-বাডিতে কিছু দিন থাকার কথা বাদ দিলে) তিন জনেই স্বামিসঙ্গ বঞ্চিতা। তিন জনকেই জীবনে প্রায়ই এক রকম ঘটনার মধ্য দিয়া চলিতে হইল,—সেই কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, সধবা হইয়া বিধবাব মত ব্রহ্মচারিণী, নিজগৃহ পর্য্যন্ত নাই, দেশ-পর্য্যটন, শাবীবিক বল ও ব্যায়াম অভ্যাস, গীতাপাঠ, নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা, —এই সবে তাহাদের যৌবনে চবিত্র গড়িয়া উঠিল। গ্রাম্য বাঙ্গালী ভদ্র ঘবের কোমলা নাবী শেষে বিদ্রোহী সন্তানবীব, ডাকাতের সর্দ্দার, ভৈববী হইযা দাঁডাইল। অতি দীর্ঘকাল দুঃখে দহিযা, দৈন্য সহিযা, সংযম কবিযা তাহারা এত শক্ত হইল। এব মধ্যে শান্তিব শরীবগঠন ও যোগশিক্ষা আগেই হইয়া গিয়াছিল, আব দুইটিব হইল "মহাপুরুষ"-জাতীয় জীবেব সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে। তিন জনের অভিজ্ঞতা একই, শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চযেব সমযেব পার্থক্য।

অথচ এই তিনটি বিবহিণী এক ছাঁচে ঢালা নহে। এত দুঃখ দৈন্যেব মধ্যেও পবিত্যক্তা শান্তিকে কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই ('আনন্দমঠ' ২-৭ বাদে)। সে কাঁদিয়াছিল শুধু এক দিন, গ্রন্থশেষে সেই পূর্ণিমাব বাত্রে শেষ যুদ্ধের পব মৃত জীবানন্দেব দেহ খুঁজিতে খুঁজিতে। "সেই শবপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পডিযা কাঁদিতে লাগিল।...শান্তি সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।" ('আনন্দমঠ' ৪-৭)।

আর প্রফুল্ল? তাহাব কান্না দেখিয়া নয়ানবউযেব বিযাক্ত বর্ণনা মনে পড়ে—

"সাগব—দেখতে কেমন?

"নয়নতাবা—গালফুলো গোবিন্দের মা। কিন্তু সেই প্রফুল্লই যখন

জানিল যে, শ্বশুর কিছুতেই তাহাকে বাড়িতে রাখিতে মত করিলেন না, তখন—

"প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল।" (১-৩)। আবার পরদিন যখন নয়নতারা তীক্ষ্ণ ছুরি মারিয়া বলিল, "দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ? ঠাকুর বলিযাছেন, [তোমাকে] চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও"—তখনও প্রফুল্ল কাঁদিল না, "দেখা যাবে" বলিয়া বিদায় হইল (১-৬)।

তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বে সে একবার কাঁদিযাছিল বটে—

"প্রফুল্ল—মেয়ে মানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

"নিশি—মেয়ে মানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।

"প্রফুল্ল—আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।"

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্, তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।" নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বরভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি। (১-১৩)।

কিন্তু দশ বৎসরের কঠোর সাধনা ও সংযমের ফলে এই কোমল বাঙ্গালীর মেয়ে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়াছে, অশ্রুসম্বরণ করিতে শিখিয়াছে। অবশেষে যখন ভাবিল যে, জীবনান্তে ব্রজেশ্বরের দেখা পাইয়াছে, তখন "প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখের জলের স্রোত ছুটিল" (৩-২)। সে যে তখন মৃত্যু বরণ করিয়া লইযাছে; শ্বশুরের মানরক্ষা করিবার জন্য, শত শত অনুচরকে বৃথা যুদ্ধ হইতে বাঁচাইবার জন্য,

নিজে সাহেবের কাছে ধরা দিবে, বিষ খাইয়া মরিবে ; এই তো জীবনের শেষ দিন আসিয়াছে, আজকার দিন সেই পূর্ব্বের দশ বৎসরের জীবন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলিবে।

ফলতঃ প্রফুল্লকে অন্তরে গৃহিণী করিয়া বঙ্কিম সৃষ্টি করিযাছেন, শান্তি শ্রীব মত নহে। নিশি সহজেই এটা ধরিয়াছিল—

"নিশি—এই কি তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম ? এই কি সন্ন্যাস ?

" এ সকল ব্রত মেয়ে মানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।...তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।

"দেবী—সে পথ খোলা থাকিলে আমি এ পথে আসিতাম না।" (৩-৮)।

প্রফুল্ল জানিত যে স্ত্রী-জীবনের পূর্ণবিকাশ রূপে নহে, অর্থপ্রতাপ ভোগে নহে, মাতৃত্বে। বৃক্ষের অভিব্যক্তির শেষ এবং সর্ব্বোচ্চ স্তর ফলে—পাতায, গন্ধে, বা ফুলে নয়। তাই প্রফুল্ল ঘরে ফিরিল।

আর শ্রী ? সেও গৃহিণী হইতে মনে মনে ইচ্ছুক ছিল, পরিত্যাগকারী, পর-হইয়া-যাওয়া, স্বামীর জন্য তাহারও প্রাণ পাগল—

"শ্রী—আমি ঈশ্বর জানি না—স্বামীই জানি।· স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। যেদিন বালিকা-বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।·· কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি।"—('সীতারাম', ১-১৪)।

অর্থাৎ শ্রীও প্রফুল্লের শেষ পরিণতিতে আসিয়া সন্ন্যাসিনীত্ব গৃহিণীত্বে লুপ্ত করিতে পারিত, কিন্তু করিল না। সন্ন্যাসিনী শ্রী সীতারামের

কাছে ধরা দিল না। কেন? অদৃষ্ট, অর্থাৎ যাহা মানুষ আগে হইতে দেখিতে পায় না, এমন একটা শক্তি সমস্ত পুরুষকার, সমস্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ ব্যর্থ করিয়া দিল। ইহাই গ্রীক ট্রাজেডির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল,—যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা ঘটিবেই, তাহাব বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে মানবের শত চেষ্টা, হৃদয়ের রক্তদান, সব ব্যর্থ হইবে,—যেমন ভাগীরথী-স্রোতে ঐরাবতও ভাসিয়া যায়। বাজা লেয়াস্ রাণী জোকাষ্টাকে গৃহিণী করিলে তাঁহাদের পুত্র পিতৃহন্তা ও মাতৃগামী হইবে, ইহাই অদৃষ্টের বাণী; মানবগণ জানিল না বুঝিল না কেমন করিয়া, কিন্তু এই ভবিতব্য অবশেষে ঘটিল (সফোক্লিজ)। শ্রী সীতারাম হইতে জোর করিয়া নিজকে দূরে রাখিল, কিন্তু "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" হইলই হইল—এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অচিন্ত্যপূর্ব্ব প্রকাবে। ঐ আর দুইটি উপন্যাসে এই অদৃষ্টের খেলা নাই। কাজেই পার্থক্য।

শ্রীযদুনাথ সবকার

"দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবন

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত আমরা প্রায় কিছুই জানি না, তথাপি তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় কিছু কম আছে বলিয়া মনে করি না, বরং, এরূপ প্রত্যক্ষ জীবন্ত পরিচয় একালের আর কোন লেখকের সঙ্গে ঘটে নাই। ইহার কারণ, লেখার মধ্যেই মানুষটি অতি সুস্পষ্ট আকারে বিরাজ করিতেছে—তাহার আকৃতি প্রকৃতি ও কণ্ঠস্বর অতিশয় অভ্রান্ত ভাবে ধরা দিয়াছে। তাই জীবন-বৃত্তান্তের অভাব—অন্য যে কোন কারণেই অনুভব করি না কেন, আজ তাঁহার তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরেও বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা জীবিত-দর্শনের মতই দর্শন করি, সে মানুষ যেন তাহার বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহার কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে অতি বিশুদ্ধ ভাব-চিন্তা বা কেবল কবিজনসুলভ কল্পনারই অভিব্যক্তি ঘটে নাই, নিজের দেহমনপ্রাণের গভীর ব্যক্তিগত উপলব্ধিই সেই রচনাকে প্রাণবন্ত করিয়াছে—ভাবুকের ভাববিলাস বা শিল্পিজনোচিত কলাকুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি কুত্রাপি লেখনী ধারণ করেন নাই। অথচ তিনি একজন খুব বড় কাব্যস্রষ্টা কবি—বঙ্কিম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ইহাই। নিজের ব্যক্তিগত ও বস্তুগত জীবন-চেতনাকে লঙ্ঘন না করিয়া তিনি যে ভাব-চিন্তার অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং আত্ম-পরীক্ষিত বলিয়া যাহার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছিলেন তাহাই সাহিত্যের আকারে অকপটে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত ব্যক্তির পক্ষে

এইরূপ আত্মপ্রচাব সাহিত্যেব পক্ষে বড়ই সুফলপ্রদ হইয়াছে, আমরা সে রচনায় কেবল কতকগুলি উৎকৃষ্ট ভাব-চিন্তা না—সেই সকলকে আশ্রয় কবিযা একটি অতিশয জীবন্ত ও শক্তিমন্ত পুরুষের অন্তরতম স্বরূপ ব্যক্ত হইযা উঠিতে দেখি।

জীবন-বৃত্তেব সাহায্যে আমরা মৃত ব্যক্তিব পবিচয় পাইয়া থাকি, জীবিত ব্যক্তিবও জীবন-বৃত্তেব প্রযোজন হয। কিন্তু তেমন সুলিখিত জীবন-বৃত্ত দুর্লভ, যাহার দ্বাবা আমবা মানুষটিকে ঠিক চিনিয়া লইতে পাবি। কাবণ, জীবন-চবিত ও ইতিহাস এক নয়—মানুষের জীবন অঙ্কিত করা, আর কালেব গতি-প্রবাহেব অঙ্কপাত কবা এক কাজ নহে। বাহিরেব সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও সুনিপুণভাবে যোজনা করিলেও ভিতবেব মানুষটি অনুমানসাপেক্ষ হইযাই থাকিবে, ঘটনা-গুলিকেও ছোট বড নানা আকারেব বেখাব মত কবিযা মানুষেব আলেখ্য রচনা কবিতে হইলে যে তূলিকাব প্রয়োজন, সে তূলিকা কাহাব হাতে আছে?—যাহা একাধাবে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, বাস্তব ও কল্পনাসাপেক্ষ তাহাকে কোনও কঠিন রেখা-বেষ্টনীব মধ্যে ধবিতে পাবা অসম্ভব। তাই, কোন মানুষেব সম্বন্ধে আমাদেব যে ধাবণা—সে ধারণা যতই ঘটনা-প্রমাণসিদ্ধ হউক, শেষ পর্য্যন্ত তাহা কতকগুলি সাধারণ চিন্তা বা সংস্কাবেব দ্বারাই গঠিত হইযা থাকে, ব্যক্তিকে আমবা সাধারণেব কোঠায় টানিযা আনিতে বাধ্য হই। এজন্য মানুষের বাহ্য-জীবন বা কীর্ত্তিকলাপ হইতেই যেখানে তাহাকে বুঝিয়া লইবাব প্রযোজন বা সুবিধা থাকে, সেইখানেই চরিত-গ্রন্থেব কিছু মূল্য আছে, কিন্তু যে মানুষ প্রধানত অন্তর্জীবনই যাপন কবিযাছে, তাহার জীবন-চবিত রচনা একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয।

অনেকে আত্মজীবন-চবিত রচনা করিযা বাহিরেব মানুষকে নিজের

অন্তরের দিক দেখাইয়া থাকেন। এরূপ আত্মজীবন-চরিতও নির্ভরযোগ্য নহে ; কারণ মানুষের নিজের সম্বন্ধে নিজের যে ধারণা, তাহাতে অতি সূক্ষ্মভাবেও আত্মাদর বা আত্মম্ভরিতা এবং সেই সঙ্গে আত্মগোপনের প্রযাস থাকাই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, পরে যেমন আমার সম্বন্ধে নানা ভুল ধারণা কবিতে পারে, আমারও তেমনই আমার সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা আবও অধিক। অতএব আত্মচরিত-লেখক যদি ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠার সহিত নিজের অন্তরের ঘটনা বিবৃত করেন, তথাপি সেই ঘটনাগুলির মাত্র মূল্য আছে, তাহার ভাব-অংশ পরিত্যাগ কবিয়া তথ্য-অংশটুকু জীবনীকারের কাজে লাগিবে ; কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য ঐ অপর ব্যক্তির সহানুভূতি ও বিচার-বুদ্ধিই শেষ পর্য্যন্ত ভরসা। আত্ম-চরিতেব লেখক নিজ জীবনের যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন—বহির্গত ঘটনা ও বাহিবের সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার যে মত ও মনোভাব প্রকাশ কবেন, তাহার মূল্যই অধিক, নিজেব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাও তাঁহার একটা মত বা মনোভাব মাত্র, সাক্ষাৎ আত্মপরিচয় তাহাতে নাই।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষের আত্মপরিচয় তাঁহাদেরই জবানিতে আমরা এক বিচিত্র উপায়ে পাইয়া থাকি। বঙ্কিমচন্দ্রেব মত কবি-ঔপন্যাসিক যে ধরণের উপন্যাস বচনা কবিয়াছেন, তাহাতে লেখক উপন্যাসের জবানিতে অনেক পরিমাণে আপনারও অন্তর্জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবি মাত্রেবই কাব্যে যে আত্মপ্রতিবিম্ব থাকে, আমি সেইরূপ আত্মপ্রকাশের কথা বলিতেছি না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিম-চন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে একটি জীবন্ত পুরুষের দেহমনপ্রাণের প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ যেন একটি ব্যক্তি তাহার রচনার ভিতর দিয়াই জীবনের সর্ব্ববিধ উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছে, আধ্যাত্মিক ও

আধিদৈবিক যত কিছু ঝড়ঝঞ্ঝার মুখে আপনার প্রাণকে স্থাপনা করিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার অবস্থান্তর ও রূপান্তর নিরীক্ষণ করিতেছে; এবং আত্মচরিত্রের যত কিছু দুর্ব্বলতা ও রিপুপারবশ্য স্বীকার করিয়া জীবনের অতি দুরূহ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছে। ইহাও জীবন—ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এইরূপ আধ্যাত্মিক সঙ্কট ও অন্তর-সংগ্রাম কম বাস্তব নহে, কারণ ইহারও মূলে আছে, বাস্তব জীবনের অনুভূতি। তাঁহার সেই চরিত-কথা তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেইজন্য সেগুলি অত্যুচ্চ কাব্যকল্পনায় মণ্ডিত হইলেও তাহাদের ভিতর একটি আর্ত্ত-পীড়িত পুরুষবীরের কণ্ঠনির্ঘোষ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে।

একালের সাহিত্যে, কাব্যের তো কথাই নাই, উপন্যাসের মত সাহিত্য-সৃষ্টিতেও, আমরা লেখকের যে পরিচয় পাই তাহাতে একটা ব্যক্তিমানসের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকে, জীবনের গভীরতর অনুভূতি, বা পুরুষের প্রাণগত উৎকণ্ঠার নিদর্শন প্রায়ই থাকে না। একালের মানুষ অতিমাত্রায় মানস-জীবন যাপন করে। ফলে, আমরা মানুষের দেহাধিষ্ঠিত বাস্তব বেদনাবাসনাময় যে পুরুষ—তাহার স্বরূপ-রসের আস্বাদ সাহিত্যে আর পাই না। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা মানুষের সেই কাহিনী কাব্যে উপন্যাসে নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে দেখিয়াছি, কিন্তু আজিকার সাহিত্যে সে দৃষ্টি সে কল্পনা নাই—সার্ব্বজনীনতার সেই দেহ-বেদিকা ভাঙিয়া দিয়া ব্যক্তির অহংসর্ব্বস্ব ভাবনাই এখন যে রসের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে মানুষকে আর পাওয়া যায় না,—পাওয়া যায় কেবল সূক্ষ্ম কারুকৌশলগঠিত এক

একটি অভিনব মানস-যন্ত্র। এই Individual বা অহংসর্ব্বস্ব ব্যক্তিত্ব ঘোষণার প্রসঙ্গে একজন সমালোচক যে আর একটি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ করিব। নভেল নামে যে কথাশিল্প আধুনিক সাহিত্যের একটি বড় বিভাগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কবিকল্পনা মানুষের চরিত্র ও মানুষের জীবনকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছে—মানুষ হিসাবেই মানুষের মর্য্যাদাকে স্বীকার করিয়াছে, ইহাতে প্রথম হইতেই এক প্রকার ব্যক্তিত্বের অভিযান সুরু হইয়াছে। কিন্তু এই যে ব্যক্তি-মানুষ—ইহারও দুই রূপ আছে, এক রূপের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছি—সমাজ বা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ, সার্ব্বজনীন মানবতার নিয়তিনিয়মচ্যুত, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তি, তেমনই আপনার মধ্যে কেবল আপনারই নয়, সেই সঙ্গে মানব-সংসারের সহজ স্বভাবসিদ্ধ আকুতি ও উৎকণ্ঠা ভোগ করিবার যে সামর্থ্য—সেও আর এক ধরণের ব্যক্তি-প্রতিভা। এই শেষের যে ব্যক্তিত্ব তাহাকে individuality না বলিয়া personality বলা যাইতে পারে। এই personalityকে বাংলায় ব্যক্তি-মানুষ না বলিয়া ব্যক্তি-পুরুষ বলিব। এই যে অপর প্রকার ব্যক্তিত্ব, ইহাকে উক্ত সমালোচক বলিয়াছেন—"a single person whose soul-struggle stands for the world-sadness and the world-stress of humanity....A human soul not merely as a strong demanding individuality but as under stress of such relation to verdict of law and to the rights of fellow mortals as to compel its development into a completed personality"। এখানে humanity, verdict of law এবং rights of fellow mortals প্রভৃতি যে কথাগুলি রহিয়াছে, তাহা হইতেই আমার বক্তব্য বুঝিতে পারা যাইবে। যে জীবনকে আমরা সাহিত্যে গভীর ও সত্য করিয়া উপলব্ধি করিতে চাই তাহা ব্যক্তির

ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি ব্যক্তিমাত্রই হয়—সে ব্যক্তিত্ব যতই প্রবল, গভীর ও সূক্ষ্ম হউক—তাহার ভিতর সৃষ্টির নিয়তিনিয়মপীড়িত মানুষের আকুতি যদি প্রকাশের পথ না পায়, তাহারই অন্তর-সংগ্রামে ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তি-বিরোধ যদি সর্ব্ব-মানবেব হৃদয়-কাহিনী হইয়া না উঠে, তবে তাহা এইরূপ completed personality হইতে পারিবে না। সকল উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টিব মূলে ইহাই আছে—কবির ব্যক্তিত্ব যখন humanity বা সাধাবণ মানবগোষ্ঠীব সহিত যুক্ত হয়, তখন যাহা নিতান্ত নিজের তাহাতেই বিশ্বমানবহৃদয়েব স্পন্দন অনুভূত হয়, যাহা অতিশয় আধিভৌতিক তাহাও আধ্যাত্মিক হইয়া উঠে—চক্ষে আশ্চর্য্য দীপ্তি ও কণ্ঠে বাগ্‌দেবতার আবির্ভাব হয়। ব্যক্তির সহিত বহুব এই যে যোগ, ইহার ফলে কবির কাব্য যেমন সর্ব্বমানবের হৃদয়শোণিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, তেমনই কবিব ব্যক্তি-হৃদয়ের ইতিহাসও তাহাতেই ধরা দিবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যে কারণে এমন উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া উঠিয়াছে—যে রচনা এমন কাব্যগুণ-প্রধান হইয়াছে, ঠিক সেই কারণেই তাহা কবিব অন্তর্জীবনেব পরিচয় বহন করিতেছে।

মানুষেব জীবনে, শক্তি ও অশক্তিব মূলে একটি কোনও রিপু বা প্রবৃত্তিকে প্রবল হইতে দেখা যায়। যাহার মধ্যে একটা এইরূপ প্রবল প্রবৃত্তির আবেগ নাই, জগতে সে ছায়াব মত বিচরণ করে, জীবনের সঙ্গে তাহাব সত্যকাব সাক্ষাৎলাভ ঘটে না। যে কণ্ঠে বিষের জ্বালা ভোগ করে নাই, সে অমৃত হয়তো আঘ্রাণ করিয়াছে—পান করে নাই; কারণ জীবনকে মন্থন না করিলে অমৃত লাভ হয় না—এবং মন্থনকালে বিষেব ভয় করিলে চলে না। এই বিষই সেই রিপু, ইহারই তাড়নায় মানুষ বাসনা-কামনাব সমুদ্র মন্থন করিয়া থাকে, যে দুর্ব্বল সে বিষমূর্চ্ছিত

হইয়া তলাইয়া যায়, যে শক্তিমান সে হস্তে অমৃতপাত্র লইয়া উঠিয়া আসে, যে ক্ষুদ্র সে মন্দবিষের মৃদু উত্তেজনায় মুগ্ধ জীবন যাপন করে, যে মহৎ সে বিষপাত্র নিঃশেষে পান কবিযাই জ্বালা নিবারণের জন্য অমৃত সন্ধান করে।) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁহার প্রাণমনের যে প্রতিকৃতি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা করিবার পূর্ব্বে এই কয়টি কথা আপনা হইতে মনে আসিল—এইখানেই তাহা লিখিয়া রাখিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজীবনেব যে উৎকণ্ঠা তাহা ভাবুকের ভাবসাধনাব মত নহে। (জীবনেব একটি গূঢ় গভীব উপলব্ধি তাঁহাব সকল চিন্তা সকল কল্পনা আচ্ছন্ন কবিযা আছে।) কোথায় কি ভাবে কোন বয়সে ইহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের আদি হইতে ইহাব পবিচয পাওয়া যায। অতিশয় অল্প বযসে বচিত তাঁহাব কবিতাগুলিতে যে একটি কল্পনা বা রসপ্রেরণাব উন্মেষ দেখা যায তাহাও যৌন-আকর্ষণমূলক। তাহাতে অকালপক্কতাব লক্ষণ আছে, সেই সকল কবিতার কৃত্রিম অলঙ্কাব-বাহুল্যের মধ্যেও বালক-কবির যে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয পাওয়া যায়, তাহা সেকালে কেহ লক্ষ্য করেন নাই। উত্তবকালে সেই ধবণের কাব্যচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, নব যুগের নব্য কাব্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের যে দিকটিকে তাঁহাব কবি-কল্পনার মুখ্য উজ্জীবনরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলির মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট অঙ্কুর রহিযাছে। (নায়িকারূপিণী নারীর প্রতি এই যে আসক্তি, ইহাই তাঁহার জীবন-দর্শনেব মূলসূত্ররূপে উপন্যাসগুলির সৃষ্টি-কল্পনায় অনুস্যূত হইয়া আছে। নারীই তাঁহার কল্পনা-বিশ্বের বাস্তব ভিত্তি, ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া পুরুষের নিয়তিচক্র কত অভাবনীয় অদৃষ্টপথে

আবর্ত্তিত হইয়াছে! পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক-ঘটিত এই যে বিরাট ও জটিল সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় ইহার শেষ নাই—এই রহস্যকে স্বীকার, এবং ইহাকে ভেদ করিয়া—দেহ ও আত্মা, রূপ ও রস, শক্তি ও অশক্তির দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইবার যে সংগ্রাম কবি বঙ্কিমের প্রাণমনের প্রতিভা তাহাতেই স্ফুরিত হইয়াছে; এবং তাহারই ফলে তিনি পুরুষের পুরুষার্থ বিষয়ে যে পরম উপলব্ধিতে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে একটি সুপরিপক্ক ফল রূপে দেখা দিয়াছে।

৩

উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-চরিত্রের যে মূল-গ্রন্থির সন্ধান পাওয়া যায়—তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নানা দিক দিয়া করা সম্ভব হইলেও, আমি তাহার যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি সে বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ ছিল পূর্ণ মনুষ্যত্বের, তাই তাঁহার উপন্যাসের কল্পনাভঙ্গিও যেমন নাটকোচিত, তেমনই তাঁহার নায়কগুলিও পূর্ণাবয়ব পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার নিজের জীবনে ও চরিত্রে তিনি ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন—জীবনের নিম্নস্তরে মানুষের কামনা বাসনার যে ক্ষুদ্রতা, আত্মস্ফূর্ত্তির যে বাধা, তাহা সে কল্পনার উপযোগী নয়। মানুষের মনুষ্যত্ব-গৌরব কেবল মানুষ বলিয়াই নহে, পরন্তু তাহার মধ্যে যে মহত্তর ক্ষুধা এবং সেই ক্ষুধার বশেই তাহার চিত্তের যে দিব্য উৎকণ্ঠা, তাহাই তাহাকে সৃষ্টির সারভূত করিয়াছে। অতএব, পুরুষবিশেষের চরিত্র, সমাজ, বংশ, শিক্ষা প্রভৃতি গুণে সেই পক্ষে যতখানি নির্ভরযোগ্য হইতে পারে, তিনি তাহার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ছোট মানুষকে তাঁহার কল্পনায় তেমন

আমল দেন নাই বলিয়া মানুষকে ছোট করিয়া দেখেন নাই। এই সকল চরিত্রের যে অন্তর-সংগ্রাম তাঁহার উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রেরই পুরুষমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহারই দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর ও স্থিরদৃষ্টি অক্ষিতারকা সেগুলিকে এমন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের বাস্তব নিয়তিকে মানুষের দেহাধিষ্ঠিত কামরূপেই তিনি তাঁহার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিতে দেন নাই। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যে শক্তিকে তিনি খাড়া করিয়াছিলেন, তাহা যেমন ক্ষুদ্র মানুষের আয়ত্ত নয়, তেমনই কামের এই মূর্ত্তিও তাহার ক্ষুদ্র চৈতন্যে ধরা দেয় না।

এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা ভুবারোহিণী, তিনি মানুষের নিয়তিকে যে দিক দিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন, যে তত্ত্বের আলোকে তিনি তাহার মুখাবগুণ্ঠন মোচন করিয়াছিলেন, তাহা বীরাচারী তান্ত্রিকের পন্থা; তাহাতে অশক্তির বিশ্বপ্রেম নাই, ডিমোক্রেসির আত্মপ্রসাদ নাই। জীবনকে যে তাহার তলদেশের পঙ্ক হইতেই ঊর্দ্ধতম শিখরে তুলিয়া ধরিয়া, এবং সৃষ্টিরহস্যের সহিত যুক্ত করিয়া, তাহার আদি অন্ত নিরূপণ করিতে চায়, তাহার কল্পনা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রকে সামান্য ও সাধারণকে পরিহার করিবেই—সে অ্যারিস্টোক্র্যাট না হইয়া পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে কবি-কল্পনার এই বিশিষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান—কাব্যের মধ্যে কবি-চরিত্রের ইহা একটি সুস্পষ্ট সঙ্কেত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে যাহারা অবাস্তব কল্পনাবিলাসের রোমান্স মাত্র বলিয়া নাসাকুঞ্চিত করে, তাহারা সাহিত্য-সমালোচনার কতকগুলি পুঁথিগত বুলি আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারা জীবনের কোনও একটা সমগ্র সত্যরূপ নিজ চৈতন্যগোচর করে নাই—কেবল পুঁথির সাহায্যে পুঁথির সমালোচনা করে। তাহারা পর-বাক্যোপজীবী,

পর-মতাপহারী, পর-প্রত্যয়াভিমানী ; তাহাদের আত্মজ্ঞান নাই। ভিতরের সেই ফাঁকি ঢাকিবার জন্য তাহারা বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি ও আর্টবাদের শরণাপন্ন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-বাদের মূলে বাস্তবের যে বেদমন্ত্র রহিয়াছে, সে মন্ত্রকে তিনি যে কেবল ভাবকল্পনার জাল পাতিয়া শূন্য হইতে আহরণ করেন নাই—নিজেরই দেহ-চৈতন্যের অন্তস্তলে, একটি পরমক্ষণে তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, এই মন্ত্রকে ত্যাগ করিবার বা পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন তাঁহার কখনও হয় নাই, ইহা যদি তাঁহার "মর্ম্মে বিজড়িত-মূল" হইয়া না থাকিত, তবে এত বড় কবি ও মনীষীর জীবনব্যাপী সাধনায় ইহারই সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গীণ সিদ্ধিলাভ ঘটিত না। জীবনকে তিনি যে কোনও স্বকল্পিত আদর্শের অধীন করিয়া দেখেন নাই, বরং তাহারই অন্তঃস্রোত নির্ণয়ে আপনার অন্তঃকরণপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে তাহার অধীন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—তিনি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টিতে কত বিষম বস্তুকে স্থান দিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। জীবনকে বা মানুষের চরিত্রকে যাহারা নিজেদেরই একটা মনোগত আদর্শে শোধন ও সুসংলগ্ন করিয়া দেখে—একটা নীতিজ্ঞান ও মার্জ্জিত রুচির অভিমান যাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের কেহ নহেন। এই জন্য তাঁহার কাব্যে তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক তথ্য বর্জ্জিত হয় নাই, অথবা যে সকল আচার-প্রথাকে আমরা একালে দুর্নীতি-দূষিত বলিয়া মনে করি—বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয় করিতেন—যেমন পুরুষের বহুবিবাহ, তাহাকেও তিনি তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-স্থানীয় পুরুষচরিত্রের সহিত যুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, তিনি জানিতেন, বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র যে নিয়ম বা যে তত্ত্বের আরাধনা করে, জীবনের সত্য তাহা অপেক্ষা গভীর ; মানুষ যেখানে

জীবনের সহিত বোঝাপড়া করিতেছে—কোনও ভাবগত সত্যের বা গণিতশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেছে না, সেখানে সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, নীতি-দুর্নীতির যুক্তিসম্মত সীমানা রক্ষা করা কঠিন; তাহাতে সৃষ্টির রহস্যকে যেমন অগ্রাহ্য করা হয়, তেমনই মানুষের যে মনুষ্যত্ব সকল অবস্থা ও সকল আচার-প্রথার উর্দ্ধে অনায়াসে উঠিতে পারে, তাহার মহিমা ক্ষুণ্ণ করা হয়। এই যে জীবন, যাহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছুই নাই—সকল গ্লানি, সকল অশুচি সংস্কার এবং অক্ষমতার ভিতর দিয়াই যাহা শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অভিমুখে, অতিশয় সঙ্কটসঙ্কুল অভিসারে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় সেই জীবনের সেই যাত্রাপথে কখনও পথভ্রষ্ট হয় নাই, বরং সুদূর গন্তব্য অপেক্ষা পথের বিপদ ও বিভীষিকার প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। মানুষ কত বড় সে জ্ঞান সত্ত্বেও মানুষ যে কত অসহায়—বড় হওয়ার যে তাড়না তাহার মধ্যে রহিয়াছে সেই তাড়নার বশেই নিয়তির সঙ্গে তাহার যে সংগ্রাম করিতে হয়, সেই সংগ্রামে তিনি সন্ধি প্রার্থনা করেন নাই—এইজন্যই তাঁহার উপন্যাসগুলি কেবল ভাবকল্পনাপ্রসূত রোমান্স মাত্র নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গের বিষয় নহে—সে আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে। তথাপি, আমি এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মানসের বা কবি-চরিত্রের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার উপন্যাস হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

৪

প্রেম ও রূপমোহ এই দুই পৃথক পিপাসা প্রায় একই প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া যে দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সৃষ্টি করে, কবি বঙ্কিম তাহা হইতে

কখনও মুক্ত হইতে পারেন নাই। নগেন্দ্র দত্ত, গোবিন্দলাল, প্রতাপ, ভবানন্দ, মবারক, সীতারাম—ইহারা সকলেই সেই অমোঘ নিয়তির নাগপাশে মূর্চ্ছিত ও জর্জ্জরিত হইয়া মনুষ্যধর্ম্ম পালন করিয়াছে—সে পরিণাম বোধ করিবার প্রবৃত্তিই তাহাদের স্রষ্টার চিত্তে নাই; বরং রসবিহ্বল কবি পরম আগ্রহে সে দৃশ্য উপভোগ করিয়াছেন। আত্মস্থ হইবার চেষ্টার ত্রুটি নাই বটে—শৈবলিনী পাপীয়সী, রোহিণী কুলটা, গোবিন্দলাল মোহগ্রস্ত, প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয়ী, ভবানন্দ আত্মঘাতী, সীতারাম ভাগ্যবিডম্বিত, অমরনাথ সংসারবিরাগী—ধর্ম্মকথা, নীতি-উপদেশ ও আত্মশাসনের ত্রুটি নাই। এই মহামৃত্যু হইতে বাঁচিবার কি আকাঙ্ক্ষা, নিয়তির উপরে জয়ী হইবার কি প্রাণান্ত প্রয়াস! কিন্তু সেই রূপমোহ বা ইন্দ্রিয়লালসার মুখে বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের যে নিদারুণ পরিণাম, কবি তাহাকেই দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছেন, এই পাপের স্বস্ত্যয়নকল্পে যত মন্ত্রই উচ্চারণ করুন—নিয়তির সেই ভীষণ-মধুর বিরাট-গম্ভীর মূর্ত্তি হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারেন নাই। প্রেমই হউক, আর রূপমোহই হউক, ফল একই, প্রতাপের প্রেম ও গোবিন্দলালের রূপমোহ দুইয়েরই পরিণাম এক—মৃত্যু ছাড়া আর পথ নাই। এই জন্য, প্রেমিক বা ইন্দ্রিয়পরবশ, যেমনই হউক—কোনও নায়ক-চরিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, নীতিপ্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র ও কাব্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এ দুইয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি, অথবা তাঁহার কবি-চিত্তে নীতিধর্ম্মের প্রেরণা আসিয়াছিল কি কারণে, কোথা হইতে।

বিষবৃক্ষ রোপণকারী নগেন্দ্র বলিতেছে—

কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবন সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ

মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। [নগেন্দ্র দত্তের স্ত্রী সূর্য্যমুখী এক্ষণে পূর্ণ-যৌবনা।]...কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়; অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই।...যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।

সূর্য্যমুখী কুন্দ অপেক্ষা সুন্দরী, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে নূতনত্ব আর নাই, তাহা আর রহস্যময় নয়, তাই নগেন্দ্র দত্ত রূপমোহের নূতন ইন্ধন পাইয়াছে। এ রূপের আকর্ষণ যেন দেহের আকর্ষণ নয়, এ যেন অতি সূক্ষ্ম অশরীরী এক লাবণ্য এক নূতন পিপাসা উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম পদার্থও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বস্তুতে পরিণত হইল---সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও রূপলালসায় প্রভেদ রহিল না। তখন তাহার মুখে শুনি--

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে?

—ইহাই হইল এক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা, অপর বঙ্কিমচন্দ্র হরদেব ঘোষালের জবানিতে বলিতেছেন—

রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না। কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্র পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।

ইহার একটি বাস্তব সত্য, অপরটি আদর্শের সত্য—একটি দেহের নিয়তি, অপরটি মনের কামনা। কিন্তু নিয়তিকে জয় করা সহজ নহে—বিষবৃক্ষ রোপণ করিতেও হইবে, তাহার ফলও ভক্ষণ করিতে হইবে।

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত-নীল-চিত্রিত প্রজাপতির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই

হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমে এরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।

কথাটা শুনিতে কেমন হইল? যে পুণ্যাত্মা সে পাপের সোপানে পদার্পণ করিবে কেন? গোবিন্দলাল পুণ্যাত্মা, রূপমোহ অনিবার্য, পুণ্যাত্মার পক্ষেও অনিবার্য!—তবে তো পাপ ও পুণ্যের আশ্রয়স্থল একই, এ দুইকে পৃথক রাখিবে কেমন করিয়া? পুণ্যাত্মা শেষে প্রায়শ্চিত্ত করে বলিয়াই পাপ তো মিথ্যা হইয়া যায় না। মিথ্যা নয় বলিয়া তাহার সত্যকে স্বীকার করিতে—বুঝিয়া লইতে হইবে। গোবিন্দলালের মত পুরুষও এই রূপমোহের নিকটে অবশে আত্মসমর্পণ করে, তাহার বিবেকবুদ্ধি, এমন কি তাহার আত্মরক্ষণ-ধর্ম্মও স্তম্ভিত হইয়া যায়—অজগরচক্ষুর দৃষ্টিসম্মোহিত পক্ষীশাবকের মত সেই পুরুষের সকল ভয় ভাবনা লুপ্ত হয়, সে বলিয়া উঠে—

এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।

অমরনাথ রজনীকে বলিতেছে—

প্রথম যৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে।...আর কখন কোন অপরাধ করি নাই। চিরজীবন, সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?

অমরনাথ অতি কঠিন আত্মসংযমের দ্বারা পাপের প্রতিরোধ করিয়াছে, কিন্তু তাহার জীবনও ব্যর্থ হইয়াছে। বিদ্যার দ্বারা সে অন্তঃকরণ মার্জ্জিত করিয়াছে, সংসারের অভিজ্ঞতার দ্বারা সে ধীর বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছে, সে ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য করিয়া গার্হস্থ্য

প্রেম-সুখের কামনা করিয়াছে। কবির তাহা পছন্দ হইল না। এত নীতিজ্ঞান, এত আত্মপরীক্ষা, এতখানি প্রায়শ্চিত্তের পরেও তাহার মত কৃপার পাত্র কে? বৈরাগ্যের পথই সে অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু তাহার এই চরম আক্ষেপোক্তির মধ্যে বিশল্যকরণীর চিহ্ন নাই—

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মেই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।...

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ তাহা তোমাকেই দিব। আজি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ। তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে? প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।

—এ আক্ষেপ কাহার? অমরনাথের তো বটেই, কিন্তু ইহার ফাঁকে ফাঁকে কবিরই আর্ত্তকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে না?

প্রেম ও রূপমোহ, এ দুইয়ের পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্র বার বার নির্দ্দেশ করিতে ত্রুটি করেন নাই—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু তথাপি এই দুইকে তিনি খুব তফাৎ করিয়া রাখিতে পারেন নাই, বরং যে প্রেম রূপজ নহে, তাহার গভীরতা স্বীকার করিলেও প্রেমকে সম্পূর্ণ রূপমোহ-মুক্তরূপে কল্পনা করিতে তাঁহার বাধিয়াছে, তাহার কারণ, এ মোহ কবির নিজেরই প্রাণের মোহ। প্রতাপ শৈবলিনীর কাহিনী একটু স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের সেই পরস্পর আসক্তির মূলে বাল্যপ্রণয়ের প্রভাবই একমাত্র কারণ নয়, তাহার প্রমাণ—"শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—

সৌন্দর্য্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল।" এক ভ্রমর ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল নায়িকা ও প্রধান নারীচরিত্রগুলি অপর সকল গুণের সঙ্গে রূপলাবণ্যেরও অধিকারিণী। নারী যতই বীর্য্যবতী, বুদ্ধিমতী এবং হৃদয়বতী হউক—রূপ তাহার চাই-ই ; রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি না হইলে, সে যেমন পুরুষ-হৃদয়ের আরতি লাভের উপযুক্ত নয়, তেমনই শক্তিমান পুরুষের বৈষয়িক বা পারমার্থিক আত্মাভিমান লোপ করিয়া তাহার জীবনে দারুণ দুর্যোগ সৃষ্টি করিতেও সে অক্ষম। রাজ্যলোভী দুরাকাঙ্ক্ষ পশুপতির অতি প্রবল বিষয়ৈষণার শাস্তি দিল মনোরমা, রাজ্যাপহারী শত্রুর হাত হইতেও সে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার মৃত্যুর শেষ কারণ হইল—এক নারী। এই নারী পরম রহস্যময়ী, রূপসী, মোহিনী।

সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল।...

পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।...দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। ...সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদিত হইল। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা,...আজি তোমার এ ভাব কেন ?"

মনোরমা উত্তর করিলেন, "আমার কি ভাব দেখিলে ?"

প। তোমার দুই মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি আনন্দময়ী, সরলা বালিকা—...সেই রূপে আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্ত্তি গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রখর বুদ্ধিশালিনী—এ মূর্ত্তি দেখিলে আমি ভীত হই।

আর একদিন পশুপতি মনোরমাকে বলিতেছে—

আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি—বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম্ম করি নাই। যাহাতে অনুরাগ তাহাই করিয়াছি, দারপরিগ্রহে অনুরাগ নাই, এজন্য তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত মনোরমালাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

—অর্থাৎ মনোরমা বিধবা, তাহাকে বিবাহ করিতে হইলে শাস্ত্রবিধি খণ্ডন করাইতে হইবে, সে শক্তি রাজারই আছে, তাই পশুপতি রাজ্য লাভের জন্য সকল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছে। তারপর রাজ্য গেল তাহাতেও দুঃখ নাই, প্রাণ যাইতে বসিয়াছিল তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই—মনোরমাকে চাই। শেষে তাহারই সন্ধানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ক্ষোভে দুঃখে পশুপতি জ্বলন্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবী অষ্টভুজার স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে গিয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিল।

পশুপতি ও মনোরমার এই যে দাম্পত্য-বিভ্রাট এবং তাহার যে কারণ, বঙ্কিমের কবি-জীবনে তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে—সীতারাম ও শ্রীর কাহিনীতে ইহাই আরও গাঢ় ও গভীর রসকল্পনায় মণ্ডিত হইয়াছে। 'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস—তখন কবির কল্পনা সবেমাত্র পক্ষবিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কাব্যরসসৃষ্টির প্রয়াস যতটা আছে জীবনকে তেমন করিয়া দেখিবার দৃষ্টি লাভ করিতে তখনও বিলম্ব আছে—ট্র্যাজেডি রচনার উপযোগী চরিত্র-সৃষ্টি তখনও কবিকল্পনার আয়ত্ত হয় নাই। তাই পশুপতি-চরিত্র এত দুর্ব্বল, এবং মনোরমা রক্ত-মাংসের মানুষ না হইয়া কাব্যলোকের অধিবাসিনী রহস্যময়ী নারী-দেবতা হইয়া আছে। শ্রী ও সীতারাম, মনোরমা ও পশুপতির প্রতিরূপ নিশ্চয়ই নহে, কিন্তু এই দুই যুগলের দাম্পত্য-মিলনের অন্তরায়—বাহিরের দৈব ও ভিতরের চরিত্রগত বৈষম্য—প্রায় এক, মনে হয়, তিনি যেন তাঁহার অপরিণত কল্পনার বীজটিকে পরিণত প্রতিভার রস-সিঞ্চনে নূতন রূপে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। পশুপতি নন্দার মত স্ত্রীই চায়—সে মনোরমার মধুর বালিকা-মূর্ত্তির ভজনা করে, তাহার দৃপ্ত মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিলে ভয় পায়। সীতারাম নন্দাকে চায় না, শ্রীকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে—"মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি,

দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত!" পশুপতি কাপুরুষ, সীতারাম পুরুষ। কিন্তু শ্রী ও মনোরমা? অবস্থার বশে একজনের স্বভাব-বিকৃতি, এবং অপ্রসর পটভূমিকার জন্য অপর চরিত্রের অস্ফুটতা না ঘটিলে, এ দুই চরিত্রের কল্পনামূলে খুব বেশি প্রভেদ নাই। এ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, একটা কথা এইখানেই বলিব—বাংলা সাহিত্যে নারী-চরিত্রকল্পনায় এমন অভ্রান্ত দৃষ্টি, এমন বৈচিত্র্য অথচ সুগভীর ঐক্যবোধ আর কোনও প্রতিভার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ কি, এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেই তাহা অনুমান করা যাইবে।

'সীতারাম' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাও প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বয়সে, এবং প্রতিভার পূর্ণ পরিণতিকালে, তিনি প্রেম ও রূপোন্মাদের যে নূতন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা যেমন অর্থপূর্ণ তেমনই কৌতুককর। "সীতারাম মনে মনে সেই মহিমময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন"—ইহাই হইল সেই তত্ত্বকথার সূত্র। সীতারামের এই মানসিক অবস্থার কারণ প্রেম, না আর কিছু? বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, প্রেমের কথা পুস্তকেই পড়িয়া থাকি, সংসারে ভালবাসা স্নেহ ভিন্ন প্রেম বলিয়া অপর কোন বস্তুর সাক্ষাৎলাভ ঘটে না। সেই স্নেহ রূপজ নয়—গুণজ, এবং তাহা জন্মিতে সময় লাগে—তাহা পুরাতনকেই আশ্রয় করে, নূতনে তাহা জন্মে না। কবির এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, শেষ বয়সে তিনি টলস্টয়ের মত মোহমুক্ত হইয়াছেন, অথবা সাংসারিক অভিজ্ঞতার ফলে জীবনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিতেছেন। এই সীতারামেই তাহার প্রমাণ আছে। যিনি

প্রতাপ-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং শৈবলিনীর জন্য তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন করাইয়াছেন, তিনি অবশ্যই প্রেম নামক বস্তু সম্বন্ধে কোন কালেই অবিশ্বাসী হইতে পারেন না, এবং যেহেতু প্রতাপের সেই আসক্তি গুণজ নহে, অতএব তাহাকে স্নেহ ভালবাসা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও চলিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও, এই তত্ত্বব্যাখ্যাকালে, নিজের জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই—রূপজ মোহকেই একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক নাম দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছেন, ব্যাধির নাম-পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। কারণ, কিছু পরেই বলিতেছেন, স্নেহ ভালবাসা যেমন পুরাতনেরই প্রাপ্য, তেমনই নূতনের নূতন বলিয়াই একটা আদর আছে। পুরাতন পরীক্ষিত, নূতন অপরীক্ষিত—"যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময় অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।"

এই নূতন যে কি, তাহা কি আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে? নগেন্দ্র গোবিন্দলাল এই নূতনেরই সেবা করিয়াছিল—ইহারই স্রোতে ভ্রমর সূর্য্যমুখী ভাসিয়া গিয়াছিল। এই নূতনের কথা বলিতে বলিতে কবিরও মনের বাঁধ ভাঙিয়া গেল—নগেন্দ্র গোবিন্দলাল ভবানন্দ প্রতাপ আর তেমন ভাবে বাঁচিয়া নাই বটে, তথাপি এই প্রৌঢ় পুরুষের কণ্ঠে

[পরবর্ত্তী অংশ ৪৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রেব জন্মেব শত-বার্ষিক উৎসবেব সম্ভাবনায় যে দেশব্যাপী উৎসাহ-উদ্দীপনাব সঞ্চাব হইযাছে, তাহাতে বঙ্কিমের লোকোত্তর প্রতিভার পুনবালোচনাব একটা স্থন্দব অবসব ঘটিয়াছে। অতিশয় দুঃখেব সহিত স্বীকাব কবিতে হইতেছে যে, বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকেব আলোচনা যথোপযুক্ত হয নাই। ইহাব অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে মাত্র দুই জন সুধী এ বিষয়ে কতকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন—গিবিজাপ্রসন্ন বাযচৌধুবী ও স্বর্গীয অধ্যাপক ললিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমেব প্রতি এই আপেক্ষিক ঔদাসীন্য আমাদেব শিক্ষিত সমাজেব একটা অমার্জ্জনীয অপবাধ। ইউরোপেব কোন দেশে তাঁহাব ন্যায় লেখকেব জন্ম হইলে, তাঁহাব সশ্রদ্ধ আলোচনায, যুক্তি-সহ বিচার-বিশ্লেষণে সে দেশেব আকাশ-বাতাস মুখবিত হইয়া উঠিত। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্তুতি-প্রশংসা না পাইযাছেন তাহা নহে; কিন্তু সে প্রশংসাব অধিকাংশ নিবেদিত হইযাছে তাঁহাব স্বদেশ-প্রেমিকতা ও দূব-প্রসাবী বাজনৈতিক দৃষ্টিব প্রতি। তাঁহাব 'বন্দে মাতরং' মন্ত্র লক্ষ লক্ষ নবনারীব কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, তাঁহার 'আনন্দমঠ' শত শত দেশবাসীব প্রাণে দেশপ্রীতিব প্রথম বীজ বপন কবিয়াছে সত্য। কিন্তু যে নিযমে আমবা বেদ-মন্ত্র উচ্চাবণ কবিযা মন্ত্র-প্রণেতা ঋষিকে বিস্মৃত হইযাছি, সেই নিযম বঙ্কিম সম্বন্ধেও অনেকটা প্রযোজ্য হইয়াছে। তাঁহাব সম্বন্ধে যে মতবাদ আমবা উচ্চাবণ কবিযাছি, তাহা ভক্তি-বিহ্বলতায় অস্পষ্ট, উচ্ছ্বাসেব আতিশয্য-বিড়ম্বিত। পক্ষপাতহীন সমালোচনার দ্বাবা তাঁহাব সাহিত্যিক আদর্শ ও কীর্ত্তিব যথাযোগ্য

মূল্য-নির্দ্ধারণ, ঔপন্যাসিক সমাজে তাঁহার চিরন্তন স্থান-নির্দ্দেশ—এদিকে বিশেষ কোন সম্মিলিত চেষ্টার কৃতিত্ব আমরা দাবি করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটি সাধারণ সমালোচনা ও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আশ্চর্য্য অন্তর্দ্দৃষ্টিপূর্ণ রসগ্রাহিতা অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে সমালোচনা-ক্ষেত্রে একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিতেন, তাঁহার নিকট এই মুষ্টি-ভিক্ষায় আমাদের মন তৃপ্ত হয় না—ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দেশপ্রেমিক বঙ্কিমের শিষ্যত্ব স্বীকার ও সাহিত্যিক বঙ্কিমের প্রতি বিমুখতা—এই অদ্ভুত সমন্বয়শীল মনোবৃত্তির একটা বিশেষ কারণ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। বঙ্কিম-পরবর্ত্তী যুগে আমাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার নদীতে যেমন জোয়ার আসিয়াছে, আমাদের সাহিত্যিক রোমান্স-প্রবণতার প্রবাহে সেইরূপ ভাটারই প্রাদুর্ভাব। রাজনৈতিক প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার আবশ্যক করে না—ইহা অতিশয় স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমাদের যে সনাতন রোমান্স-প্রবণতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী যুগে সঙ্কুচিত হইয়া এখন অতি শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্কিমের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগ এক বিপ্লবকারী রুচি-পরিবর্ত্তনের যুগ। ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের সহিত নিবিড়তর সংযোগের ফলে আমাদের সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ অনুসৃত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য সমাজে কতকগুলি অপ্রতিবিধেয় ও স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে ও ইহাদের আলোচনা সাহিত্যেরও প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুখ্য হইতেছে—যৌন ও দারিদ্র্য-সমস্যা।

পাশ্চাত্য দেশে সমাজনীতির আদর্শ-বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলতার জন্য এবং ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে ক্রম-বর্দ্ধমান অবস্থা-বৈষম্যের জন্য এই সমস্যাগুলি জীবনে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, এবং জীবনের মর্ম্মস্থল হইতে সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে স্বতঃই স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সমস্ত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতা-প্রধান ও রোমান্স-বিমুখ সাহিত্যিক মনোবৃত্তিও গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমাজে এই সমস্ত প্রশ্ন কেবল অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্যের অনুকরণে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়া এই সমস্ত অর্দ্ধ-কৃত্রিম সমস্যাবিচারে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, এবং ইহার অনুকূল সাহিত্যিক ভঙ্গি ও মনোবৃত্তি অর্জ্জনে সচেষ্ট হইয়াছে। ইহাই বঙ্কিমের সঙ্গে অতি-আধুনিক যুগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিচ্ছেদ। এই-জাতীয় সমস্যা আলোচনার জন্য যেরূপ আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োজন, তাহার অভাবই অতি-আধুনিকের চক্ষে বঙ্কিমের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ত্রুটি। ইহাই সাধারণত বঙ্কিমের অবাস্তবতা, গভীর মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

তারপর অক্ষমতাও বঙ্কিমের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। বঙ্কিম ঐতিহাসিক প্রতিবেশ হইতে যে রোমান্স আহরণ করিয়া আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তীরা সেই রোমান্সের মূলসূত্র ধরিতে পারেন নাই। ইতিহাসলব্ধ রোমান্স উপন্যাস-ক্ষেত্রে বঙ্কিম এবং রমেশচন্দ্র ও নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের যখন যোদ্ধবেশ, যখন ইহা বীরত্ব-প্রভায় ভাস্বর, তখন ইহার গতিবেগ ও দীপ্তি সাধারণ জীবনে সংক্রামিত হইয়া ইহাকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে। ইতিহাসের এই রণোন্মাদ জীবনের তালকে দ্রুততর করে,

ইহার বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একটা বিরাট উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সংহত করিয়া এক স্মরণীয় বিকাশের দিকে লইয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এই বীরত্বের অভিনয়, এক বিশাল ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অবসর, দেখিতে পান না।—আধুনিক ইতিহাস কূটনীতি ও তার্কিকতার লীলাক্ষেত্র। ঐতিহাসিক কল্পনার একান্ত অভাবের জন্য, অতীত ইতিহাসে পুনর্জীবন-সঞ্চার করিতে বঙ্কিম যেটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা তাহার কাছা-কাছিও যাইতে পারেন না। সুতরাং ইতিহাসের সিংহদ্বার তাঁহাদের নিকট চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসে ইতিহাস-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের বিরাট প্রাঙ্গণতলে তিনি নিজের আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের দুই একটি ছায়ামূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু দেখেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে বঙ্কিম-প্রভাবের খর্ব্বতার ইহাও একটি অন্যতম কারণ।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিপরীত-মুখী প্রভাব। বঙ্কিমের তিরোভাব হইতে না হইতেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ আবির্ভাব আমাদের সমস্ত বিচার-শক্তি ও রসবোধকে এক সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই উদীয়মান সূর্য্যের প্রখর কিরণে আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে—সাহিত্যের আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তাধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নব জ্যোতিষ্কের আড়ালে পড়িয়া বঙ্কিমের স্মৃতি যে অপেক্ষাকৃত ম্লান ও ধূসর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের রোমান্স বঙ্কিম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয়—ইহার উদ্ভব ইতিহাসের বহিঃপ্রাঙ্গণে নহে, লেখকের নিজ মানস-কল্পলোকের মধ্যে। তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী কাব্য-শক্তি উপন্যাসকে কবিতার

অধীন করদ রাজ্যে রূপান্তরিত করিয়াছে। আবার তাঁহার 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে আধুনিক সমস্যা চিরন্তন সমাজ-গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া একটা অসাধারণ তীব্রতা লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমের সমাজ-বেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত, বাহিরের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত সমস্যা রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় এত তীক্ষ্ণ ও প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে নাই। শরৎচন্দ্রও মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের ধারারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার রোমান্স আসিয়াছে সমাজ-শৃঙ্খলহীন ভবঘুরে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও পল্লীবালকসুলভ নির্ভীক দুঃসাহসিকতার কাহিনী হইতে। তিনি প্রেমের উদ্ভব-রহস্য, ইহার বিধি-নিষেধ উল্লঙ্ঘন-প্রবণতা ও সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতের যেরূপ গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, বঙ্কিমের বিশ্লেষণে সেরূপ বাস্তবতা ও অন্তর্দৃষ্টি নাই। বঙ্কিমের প্রেমের ধারণা প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ-রীতি হইতে সংগৃহীত, তাঁহার ভ্রমর, সূর্যামুখী, কুন্দনন্দিনীর মধ্যে প্রেমের যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা মোটের উপর চির-প্রথাগত পৌরাণিক তট-ভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে তিনি সনাতন মিলন-বিরহ, অভিমান-মনোমালিন্য, ও পুনর্মিলনেরই শোভাযাত্রা দেখিয়াছেন। তাঁহার প্রেম-কাহিনীতে দুইটি মাত্র প্রবল বিপরীত ধারার প্রবাহ লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি ধারার মধ্যে আবার যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীচি-বিক্ষেপ, সংশয়-আন্দোলনের মৃদু কম্পন অনুভূত হয়, তাঁহার অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে সেগুলি ধরা পড়ে নাই। অবৈধ প্রেম তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন কবিত্বময় সাঙ্কেতিকতার মধ্য দিয়া, আণুবীক্ষণিক দিন-লিপির মধ্য দিয়া নহে। তাঁহার রোহিণী কি করিয়া গোবিন্দলালের সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার মূলসূত্রটি তিনি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকটিত করিয়াছেন; তাহার অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা

মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে। গোবিন্দলালের সমবেদনায় এই ক্ষীণ প্রেমশিখা উজ্জ্বল হইয়াছে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরার চেষ্টাতে ইহার অপ্রশমিত বেদনার অতর্কিত বিকাশ আমাদিগকে বিস্ময়-ব্যথিত করিয়াছে। গোবিন্দলালের দিক দিয়াও একটা অনুরূপ আকর্ষণ একটি মাত্র পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত দেখাইয়াই তিনি বিশ্লেষণ-কার্য্য স্থগিত রাখিয়াছেন। হৃদয়ের বিক্ষোভ ও আকর্ষণ কি করিয়া দৈহিক সম্বন্ধের নাগপাশে জড়িত হইয়া পড়িল, তাহার গ্রন্থিবন্ধনগুলি নিখুঁতভাবে দেখানো তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। প্রলোভন ও পতন—ইহার মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলি পাঠক অনায়াসেই কল্পনা করিয়া লইতে পারিবে, এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহার বিশ্লেষণে ইচ্ছাপূর্ব্বকই অনেকটা ফাঁক রাখিয়াছেন। তাঁহার সুরুচি ও সংযম জ্ঞান এইখানে তাঁহার কলমের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক ঔপন্যাসিক ও পাঠক কিন্তু এই সঙ্কোচের সমর্থন করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, বঙ্কিম যে স্তরগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন, ঠিক তাহাদের মধ্যেই কোন বিশেষ প্রণয়-কাহিনীর অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। প্রায় সমস্ত প্রেমেরই আদি ও অন্ত—আকর্ষণ ও পদস্খলন একরূপ, যাহা কিছু বৈচিত্র্য তাহা ঐ মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলির মধ্যেই বিদ্যমান। আবার বঙ্কিমের উপন্যাসে পদস্খলনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—মোহভঙ্গ ও অনুতাপ। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস এই সনাতন নীতির অনুমোদিত পরিসমাপ্তির বৈধতা স্বীকার করে না। বর্ত্তমান যুগের ঔপন্যাসিক সমাজবিধি উল্লঙ্ঘনের মধ্যে হয় প্রশংসার্হ বিদ্রোহ ও মুক্তির আনন্দ আবিষ্কার করেন, না হয় মনুষ্যত্বের আরও গভীরতর অবনতি, নিদারুণতর লাঞ্ছনা, চরম অধোগতির সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেন। আর্টের পদ্ধতি ও আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্কিমের সহিত তরুণ

পাঠকের এই মতভেদ আজ তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কুহেলিকা কাটিয়া গেলে সূর্য্যালোক যেমন দীপ্ততর হইয়া উঠে, সাময়িক ভ্রান্তি-নিরসনের পর বঙ্কিমের প্রতিভাও সেরূপ দেদীপ্যমান হইবে—ইহা আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহের ব্যাপক সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে সম্ভব নহে, বর্ত্তমান উপলক্ষও সেরূপ চেষ্টার প্রতিকূল। আমি কেবল এখানে কোন্ কোন্ বিশেষ গুণের উপর তাঁহার সুবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ আধুনিকতা। বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে আধুনিকতার প্রবর্ত্তনের জন্য অনেকেই কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন। সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য—রাজা রামমোহন রায়, তিনিই প্রথম শাস্ত্রালোচনায় ও ধর্ম্মজীবনের বিচারে স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তন করেন। সে হিসাবে তিনিই বঙ্গদেশে আধুনিকতার অগ্রদূত। তাঁহার পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দাবিই অগ্রগণ্য। ইহারা নানা দিক দিয়া পুরাতন সমাজ-মনে স্বাধীন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া, তাহার অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোণগুলি প্লাবিত ও পরিষ্কৃত এবং সেখানে অনেক নূতন চিন্তা ও আদর্শের বীজ বপন করিয়াছেন, যাহা এখন ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আধুনিকতার সৃষ্টি করিতে শুধু যে মৌলিক চিন্তার প্রয়োজন হয়, তাহা নয়, নূতন ভাব-প্রকাশোপযোগী ভাষাও তাহার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর নূতন ভাবের সন্ধান পাইয়াছিলেন; কিন্তু ভাষার দিক দিয়া তাঁহারা অতীত সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণতার সহিত যুক্ত ছিলেন। তিল তিল করিয়া

নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা আধুনিক মনোবৃত্তির ভিত্তি-রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা আড়ষ্ট, জড়তাগ্রস্ত ও মন্থরগতি ছিল। আধুনিক মনের লীলা-চঞ্চলতা, ক্ষিপ্রগতি, সব্যসাচিত্ব (versatility), বিদ্যুৎশিখার ন্যায় ভাস্বর পরিবর্ত্তনশীলতা, আবেদন-বৈচিত্র্য (variety of appeal) বঙ্কিমচন্দ্রেই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণবিকশিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের তূণীরে এক প্রকারেরই অস্ত্র ছিল—তাঁহাদের গুরু-গম্ভীর বচনবিন্যাস, অভ্রান্ত শাস্ত্রবিচার ও উঁচু সুরে বাঁধা নৈতিক আবেদন প্রতিপক্ষের স্থূল গণ্ডার-চর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। বঙ্কিমচন্দ্র যুদ্ধ চালাইবার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন, তাঁহার আক্রমণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের গদাযুদ্ধে পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার তূণীর বিচিত্র আয়ুধে পূর্ণ ছিল—তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্র, প্রচ্ছন্ন উপহাস, গূঢ়ার্থ রূপক, অচ্ছেদ্য তর্কজাল ও শ্রেণীবিন্যস্ত যুক্তি-পরম্পরা, ইতিহাসের ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত পূর্ব্বোদাহরণ (precedent), অফুরন্ত স্বতঃ-উৎসারিত রসিকতা, লঘু-কল্পনার ইন্দ্রজাল (fantasy) ও গভীর মর্ম্মস্পর্শী অশ্রুপূর্ণ আবেগ—এই সমস্ত অস্ত্রেই তাঁহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল। পুরাণবর্ণিত বীরের ন্যায় তিনি তাঁহার প্রতিপক্ষের যুক্তিকে ক্রোধের অগ্নিবাণে ভস্মীভূত করিয়াছেন, অজস্র উপহাসের বরুণাস্ত্রে গঙ্গাপ্রবাহে ঐরাবতবৎ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন ও ভাবাবেগের বায়ব্যাস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করিয়া, রেণু-পরমাণুতে গুঁড়া করিয়া উড়াইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবাবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থে দেশাচারকে সম্বোধন করিয়া যে দীর্ঘ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোমল দয়ার্দ্র হৃদয় ও অপরিণত তর্কশক্তি একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহনিবারণ-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে বহুবিবাহ রোধকল্পে ধৃতাস্ত্র লেখককে ডন কুইক্সোটের সহিত

তুলনা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রচেষ্টাকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। বঙ্কিমের যোদ্ধবেশ সুদর্শনহস্ত বিষ্ণুর ন্যায় যুগপৎ সম্ভ্রম ও ভীতির উদ্রেক করে। তাঁহার শাণিত অস্ত্রের সম্মুখে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গ অভিমন্যুর নিকট কুরুসৈন্যের ন্যায় পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার তর্কের মধ্যে একটু জোর-জবরদস্তির ভাব, প্রতিপক্ষের প্রতি একটা অবহেলা ও অবজ্ঞার সুর সময় সময় লক্ষ্য করা যায়। ইহা নীতির দিক দিয়া হয়তো সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য নহে, কিন্তু তর্কযুদ্ধে ইহা প্রত্যেক আঘাতের শক্তি বাড়াইয়া প্রতিপক্ষকে একেবারে ভূমিশায়ী করিয়া ফেলে। বঙ্কিম যদি একখানিও উপন্যাস না লিখিতেন, তথাপি তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অমর করিত। আর এই যুদ্ধের উপযোগী ভাষা তাঁহার হাতে শাণিত তরবারির ন্যায় শ্লেষ-বিদ্রূপ-ভাবাবেগের সূর্য্যালোকে ঝকমক করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাষাই তাঁহার সম্পূর্ণ আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের ন্যায় 'ভূধর হইতে ভূধরে ছুটিয়া' 'রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া' বাধা-বিঘ্নের উপলখণ্ডকে সবলে অপসারিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, গিরিনদীর নৃত্য, চপলতা ও ধূর্জ্জটির জটাজালের ন্যায় মহান গাম্ভীর্য্য, উভয় গুণেরই অপরূপ সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় কৃতিত্ব হইতেছে—তাঁহার উপন্যাসাবলীর পরিকল্পনার মৌলিকতা। আমরা প্রায়ই বঙ্কিমের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা আওড়াইয়া থাকি। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, এই ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহ ১৮৬৫ সাল হইতে ১৮৮৭ পর্য্যন্ত এই একুশ বৎসরের মধ্যে রচিত হয়। এই সময়ে ইংরেজী

সাহিত্যে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক একটি দিকপাল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে Scott ও Jane Austen, এবং এই যুগে Dickens, Thackeray, George Eliot, Charlotte Bronte, George Meredith ও Thomas Hardy প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা লেখনী চালনা করিতেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রণালী ও ভাবভঙ্গি ইঁহাদের কাহারও দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া নিজ মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। আমরা সাধারণত বঙ্কিমকে স্কটের সহিত তুলনা করি, ও তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহের সহিত আয়েষা-তিলোত্তমার প্রণয় সম্পর্কটির সহিত Ivanhoe-র Rowena-Rebecca-র সম্বন্ধের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়া থাকি। এই সাদৃশ্য-আবিষ্কার সম্পূর্ণ অনুমানসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। বঙ্কিম যে স্কটের নিকট তাঁহার উপন্যাসের মূল ঘটনা সম্বন্ধে ঋণী, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। দুই জন ঔপন্যাসিকের রচনায় নায়ক-নায়িকার সম্পর্কে সাদৃশ্য থাকিলেই যে নিছক ঋণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর এই ঋণ মানিয়া লইলেও বঙ্কিমের মৌলিকতার কোন হানি হয় না। এই দ্বৈত প্রণয়-কাহিনীটি তিনি সম্পূর্ণ নূতন প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, হতাশ-প্রেমিকা Rebecca-র সহিত আয়েষার, ও Rowena-র অহঙ্কৃত পরুষ ভাবের সহিত তিলোত্তমার বালিকাসুলভ কোমল ব্রীড়াসঙ্কুচিত ভাবের কোনই সাদৃশ্য নাই। সামাজিক অবস্থার দিক দিয়াও Rebecca ও আয়েষা তুলনীয় নহে—Rebecca তদানীন্তন যুগের ঘৃণ্য পতিত ইহুদিতনয়া, আয়েষা নবাবনন্দিনী। ইহা ছাড়া, স্কটের সহিত বঙ্কিমের রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্কটের কৃতিত্ব ইতিহাস-পরিবেশ রচনায়, নিজের দেশের কৃষক ও অন্যান্য

নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের সরস চিত্রণে ; নায়ক-নায়িকার চরিত্র-সৃষ্টি ও গভীর ভাবাবেগ বর্ণনায় তাঁহার অক্ষমতা সুস্পষ্ট। বঙ্কিমের ইতিহাস অধিকাংশ স্থলে ক্ষীণ ও কাল্পনিক, নিম্নশ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই। কিন্তু ভাব-গভীরতা ও কল্পনা-সমৃদ্ধির দিক দিয়া তাঁহার স্থান স্কটের অনেক উর্দ্ধে। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গি, জীবন-সমালোচনা, মনুষ্য-জীবনে নিগূঢ় দৈবের লীলা ফুটাইয়া তোলার প্রণালী, সরস কথোপকথন-চাতুর্য্য, ভাবোচ্ছ্বাস—এ সমস্তই তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব ও প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত। পরিধির সঙ্কীর্ণতা ও সংঘাতের স্থায়িত্ব-কাল বাদ দিলে বঙ্কিম যে কোন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ ঔপন্যাসিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। উপন্যাসের কাঠামো ও পটভূমি তিনি পশ্চিম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর সমস্যা সম্পূর্ণরূপে এতদ্দেশীয়, বঙ্গদেশের সমাজ ও পরিবার-প্রতিবেশ হইতে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে উদ্ভূত। ইউরোপীয় সমস্যা বাঙ্গালীর পোষাকে সাজাইয়া, বাঙ্গালীর ব্যবহার ও ব্যক্তিগত জীবনকে ইউরোপীয় সমাজনীতি ও দার্শনিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া বঙ্কিম সস্তায় বাহাদুরি লইবার কোন প্রবৃত্তি দেখান নাই। তাঁহার ভ্রমর-সূর্য্যমুখীর অভিমান স্নিগ্ধ ও উত্তাপহীন—কেন না, তাহারা চিরন্তন সমাজনির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্ত্তিত হইয়াছে, কক্ষচ্যুত তারকার উল্কাগতি ও অস্বাভাবিক প্রখর দীপ্তি তাহাদের নাই। বঙ্কিম-প্রতিভার বিশ্লেষণ-কালে তাঁহার মৌলিকতার এই শ্রেষ্ঠ গৌরব আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

বঙ্কিমের তৃতীয় কৃতিত্ব এই যে, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মদাতা। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাধারণ পরিকল্পনার জন্য তিনি যে স্কটের নিকট ঋণী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস

ও ব্যক্তিগত জীবনের সম্মিলনের উপর এই-জাতীয় উপন্যাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—এই মূলসূত্র সমস্ত পরবর্তী ঔপন্যাসিক স্কটের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। বঙ্কিমের ইতিহাস-পরিধি দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর পর্যন্ত প্রসারিত। অবশ্য তাঁহার ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ফাঁক আছে। পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত তুলনায় তাঁহার ইতিহাস দায়িত্বজ্ঞানহীন কাল্পনিকতা ও তথ্যহীন সঙ্কেতের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু ইহার জন্য দায়িত্ব বঙ্কিমের নহে, কেন না, এই মন্দভাগ্য দেশে বিশ্বাস-যোগ্য, তথ্যবহুল ইতিহাসের একান্ত অভাব। ইতিহাসের অভাব ছাড়া আর একটি কারণে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের রস জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই—তাহা সাধারণ দেশবাসীর ঐতিহাসিক আন্দোলনের সহিত সম্পর্কহীনতা ও অসহযোগ। দেশে যখন রাষ্ট্র-বিপ্লব আসিয়াছে, তখন তাহা রাজা বা রাজবংশীয়দের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ পারিবারিক জীবন এই ঝটিকায় বিপর্যস্ত হয় নাই, নিজ চিরন্তন নিস্তরঙ্গ স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসে ইতিহাস-প্রভাব তুল্যরূপ প্রবল বা গভীর হয় নাই—ইতিহাস-অংশের সহিত ব্যক্তিগত জীবন সব ক্ষেত্রে সমান নিবিড়ভাবে বিজড়িত হয় নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনৈতিহাসিকতা সেরূপ মারাত্মক ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তুর্ক-বিজয়ের সহিত হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ, পশুপতি-মনোরমার রহস্যজড়িত সম্পর্কের সহিত ইহা বরং অপেক্ষাকৃত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। তুর্ক-বিজয়ের সময় দেশের সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল বা তাহার অব্যবহিত কারণ কি, তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ ইতিহাসেও নাই—সুতরাং বঙ্কিমের উপন্যাসে

যে থাকিবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! তবে গৌড় অধিকার ও লুণ্ঠনের চিত্রটি যেন আগ্নেয় অক্ষরে লিখিত হইয়াছে—এখানে আশ্চর্য্য স্বচ্ছ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কল্পনা ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। আর সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক গৌড়-বিজয়ের কিম্বদন্তীর অন্তরালে অবিসংবাদিত বিশ্বাসঘাতকতার যে কঙ্কাল উঁকি মারিতেছে, বঙ্কিম তাহাতে রক্ত-মাংস যোগ করিয়া, একটু আত্মঘাতী হীন চাতুর্য্য ও প্রণয়াকাঙ্ক্ষা মিশাইয়া পশুপতিরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। পশুপতি ঐতিহাসিক চরিত্র নহে, কিন্তু সে না হইলে ইতিহাসের পাদপূরণ হয় না। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাসের প্রাধান্য, ইতিহাসের ঝটিকাবর্ত্ত নায়ক-নায়িকাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া তাহাদের জীবনে প্রেমের অগ্নিশিখা জ্বালিয়াছে। উপন্যাসে ষোড়শ শতাব্দীর কোন সামাজিক চিত্র নাই—তবে chivalry বা ক্ষাত্রযুগের একটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। পাঠান-মোগল-রাজপুতের জাতিগত বৈষম্য দেখানো হয় নাই, তবে কতলু খাঁ ও ওসমানের চরিত্রে দুর্দ্দমনীয় অসংযত আবেগের বিবরণে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় মিলে। বিমলার অসমসাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ব্যক্তিগত গুণ হইলেও কাল-প্রভাবেরও ইঙ্গিত বহন করে। আর বিমলার সহিত বীরেন্দ্রসিংহের সম্পর্কে ও অভিরাম স্বামীর আত্ম-কাহিনীতে যে সামাজিক দুর্নীতি ও শিথিলতার ছবি পাওয়া যায়, তাহাকে মোটামুটি যুগধর্ম্মব্যঞ্জক বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'কপালকুণ্ডলা'তে ইতিহাস অত্যন্ত গৌণ—মতিবিবিকে প্রথম নুরজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বিনী, পরে নবকুমারের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী করিয়া দেখানোতে প্রকারান্তরে নবকুমারের গৌরববৃদ্ধির

ব্যবস্থা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা যে রাজ্যের অধিবাসিনী, ইতিহাসের সন তারিখ মিলাইয়া তাহার সীমা-নির্দ্দেশ করা যায় না। 'রাজসিংহ' সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক উপন্যাস—ইহার মধ্যে দিল্লী-সম্রাটের ঐশ্বর্য্য-সমারোহপূর্ণ রাজসভা ও পারিবারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ হৃদয় বিক্ষোভ চিত্রিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের কথা ইহাতে নাই, কিন্তু রাজনৈতিক কূট-ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে যে সনাতন মানব হৃদয় রাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালে তাহার চিরন্তন ক্ষুধা-আকাঙ্ক্ষা-অভিমান, মনোবেদনা লইয়া আন্দোলিত, তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। তাহার পর বঙ্কিম একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। 'সীতারামে' ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের অরাজকতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সাধারণ জীবন-যাত্রার আমরা যে পূর্ণতর চিত্র পাই, তাহার কারণ ইহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান যুগের বিশেষ প্রভেদ নাই। গঙ্গারামের কৃতঘ্নতা, রমার ভাব বিহ্বলতা, সীতারামের পদস্খলন—এ সমস্তই প্রায় আমাদের আধুনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়াই অনুভূত হয়। সীতারাম যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াইয়া জাতিগত জীবনে শিকড় গাড়িতে পারে নাই—কাজে কাজেই, তাঁহার চরিত্রের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধারণ প্রজার শোচনীয় ঔদাসীন্য রামচাঁদ-শ্যামচাঁদের নিরুদ্বেগ নির্লিপ্ত ব্যবহারে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। আধুনিক সীতারাম কামান দাগেন না, ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃতা করেন—কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠান ভূমিসাৎ হওয়ার ব্যাপারে আমরা সীতারামের যুগের অধিক অগ্রসর হই নাই।

'চন্দ্রশেখরে' ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভিত্তি-পত্তনের কাহিনী বিবৃত

হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস এখানে সুদূর দিকচক্রবালের মত উপন্যাসকে নির্লিপ্তভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। ইতিহাস-সূত্রে ইংরেজের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাসিম নিয়তির দুশ্ছেদ্য বন্ধন-রজ্জুতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইতিহাসের আর বিশেষ প্রাধান্য নাই। ভাগীরথীতীরস্থ বেদগ্রামের সামাজিক জীবন, প্রতাপ-শৈবলিনীর নির্দোষ সুখস্বপ্নময় কৈশোর-প্রণয়—এ সমস্তই আমাদের সুপরিচিত, অতীতের কুহেলিকা-ভেদকারী দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে ইহাদিগকে চিনিয়া লইতে হয় না। সুতরাং বঙ্কিম এখানে পরিচিত ভূখণ্ডেই পদক্ষেপ করিয়াছেন। মীরকাসিমের চরিত্র, গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরেজ বণিকের দৃপ্ত শৌর্য্য ও আত্মপ্রত্যয়—এইগুলি বঙ্কিমের ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির সুন্দর পরিচয়। 'আনন্দমঠ' ঠিক ইহার অব্যবহিত পরের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এখানকার আকাশ-বাতাস আদর্শলোকের অপার্থিব জ্যোতিতে পরি-ব্যাপ্ত। এই ইন্দ্রজালমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে ইতিহাসের পরিচয়পত্র লইয়া প্রবেশলাভ করা যায় না। এখানে অতীতের ছদ্মবেশে দেশ-প্রেমিকের কল্পনা-প্রসূত সোনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, কাজেই ইহা ইতিহাস-রাজ্যের বহির্ভূত। পদচিহ্ন গ্রামে কোন কৌতূহলী পথিকের পদ-চিহ্ন পড়িবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি দুর্ভিক্ষ ও মহা-মারীর যে শুষ্ক শীর্ণ কঙ্কাল-কণ্টকিত পটভূমিতে এই সোনার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সহিতই চিত্রিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী' আর একটু পরের সময়ের প্রতিকৃতি। এখানেও ঐতিহাসিক পটভূমিতে আদর্শবাদের মূর্ত্তি-স্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য। তবে প্রফুল্ল তাহার নিষ্কাম ধর্ম্মে শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও সন্তান-সম্প্রদায়ের মত একেবারে কল্পলোকের উচ্চস্বর্গে

বিচরণ করে না। সে রাষ্ট্রবিপ্লবের সিংহাসন হইতে বাঙ্গালী পরিবারের গৃহকর্ত্রীর পদে নামিয়া আসিয়াছে। ভবানী পাঠকের কল্পনা সত্যানন্দের মত এরূপ আকাশ-স্পর্শী নহে। প্রফুল্লর জীবন-সমস্যা খাঁটি আধুনিক যুগের জিনিস—হরবল্লভ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। 'দেবী চৌধুরাণী'র ইতিহাসাংশ বাঙ্গালায় ইংরেজ-শাসনের দৃঢ়ীকরণের প্রথম যুগের ব্যাপার, সুতরাং এখানে ঐতিহাসিক প্রায় সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী। অরাজকতা দমন ও শান্তি স্থাপনের জন্য ইংরেজের ব্যর্থ প্রয়াসই দেশের অভ্যান্তরীণ বিশৃঙ্খলা সূচিত করে। এই বিশৃঙ্খল যুগের এলোমেলো বাতাসে একজন গৃহস্থ-বধূ দস্যুদলনেত্রীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহাই এ যুগের ইতিহাস-প্রভাবের বিশেষ পরিচয়। বঙ্কিমের ইতিহাস ত্রুটিবহুল ও অনেকাংশে অনুমানসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। তথাপি তিনি ও রমেশচন্দ্র ছাড়া আর কেহ অতীতের মানবিকতা ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই, ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বশেষ কথা—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা উপন্যাসের যে অদ্ভুত রূপান্তর সাধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কীর্ত্তিসৌধের ভাস্বর স্বর্ণচূড়া। উপন্যাসের চরম কৃতিত্ব মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের সমস্যা-সংঘাতগুলিকে মহান ও গৌরবময় প্রতিপন্ন করা, মনুষ্য-জীবনের জটিল দুর্জ্ঞেয়তাকে—ইহার পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রামের তীব্রতাকে ফুটাইয়া তোলা। এই বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তীদের সহিত তুলনায় বঙ্কিমের কীর্ত্তি স্বতঃই প্রতিভাত হইবে। বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র স্থানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের সঙ্গে ইহার কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! 'আলালের ঘরের দুলাল' এক প্রকার মিশ্র ও গঠনসামঞ্জস্যহীন রচনা. ইহার মধ্যে বাস্তব-বর্ণনা, সরস কথ্য ভাষার সহযোগে ঘটনা-বিবৃতি, চরিত্র-চিত্রণ, নীতিপ্রচার-মূলক

বাগাড়াম্বর প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর অদ্ভুত সংমিশ্রণ বিদ্যমান। ইহাকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না বলিয়া উপন্যাসের ভ্রূণাবস্থা বলা যাইতে পারে। ঔপন্যাসিকেব কেন্দ্রানুগ দৃষ্টি, ঐক্যবিধায়ক মনন-শক্তিব এখানে একান্ত অভাব। লেখক কতকটা শিশুব মত চোখেব সামনের যে দৃশ্য, তাহা দ্বাবাই আকৃষ্ট হইযা ও অসংলগ্নভাবে টীকা-টিপ্পনী-মন্তব্য যোজনা কবিযা কলানৈপুণ্যেব দিক দিযা নিজেব শৈশবোচিত অপবিণতির পরিচয দিয়াছেন। মতিলালেব দুর্দ্দশা ও অনুতাপ, বামলালেব মহানুভবতা, ভ্রাতাদেব পুনর্ম্মিলন—এ সমস্তই যেন লঘু, হালকা ভাবে আমাদেব স্পর্শ কবে—এ যেন রূপকথাব দাযিত্বহীন, সুলভ নীতি-নিযন্ত্রিত, 'সব ভাল যাব শেষ ভাল'-জাতীয জীবনযাত্রাবই একটা বাস্তবতব সংস্করণ। 'আলালের ঘবেব দুলাল' পডিযা কি আমাদেব জীবনেব অপবিমেয় বহস্যময়তা সম্বন্ধে কোন ধাবণা হয? এই বিষযে বঙ্কিমেব উপন্যাসেব প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয। তাঁহাব অপবিণত বচনাও আমাদেব অন্তবে এক গভীব সুবেব বেশ ধ্বনিত কবে। আযেষাব ব্যর্থ প্রেম একটি জলভাবনত বর্ষণোন্মুখ মেঘের মতই আমাদেব অন্তবতলে ছাযা-পাত করে। উদাব মনোবৃত্তিব সহিত নৈবাশ্যময বিফলতাব বিধি-নির্দ্দিষ্ট সংযোগ উপলব্ধি কবিয়া মন সম্ভ্রম-বিস্ময়ে অবনত হয। কপাল-কুণ্ডলাব জীবনেব অতর্কিত পবিসমাপ্তি সমাধানহীন প্রশ্নেব মতই আমাদেব অন্তবদ্বাবে কবাঘাত কবিতে থাকে। সমুদ্রেব ঢেউ একদিন যাহাকে লোকালযেব বালুকাতটে শোযাইয়া দিযা গিযাছিল, জাহ্নবী-তবঙ্গেব আর একটি উচ্ছ্বাস আসিযা তাহাকে আবাব সেই অজানা দেশে ভাসাইয়া লইযা গেল—ইহাব আবেদন ববীন্দ্রনাথেব এক ভাবব্যঞ্জনাময কবিতাব সুরের মত আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত কবে। মানস-ব্যভিচাব আমাদেব এই পবিত্রতাস্পর্দ্ধী সমাজেও নিতান্ত বিবল নহে; এবং যে

পাপ মনের সীমা ছাড়াইয়া কর্ম্মরাজ্যে পদক্ষেপ না করে, তাহা আমাদের অত্যন্ত কঠোর নীতিবায়ুগ্রস্ত সমালোচকেরও দৃষ্টি এড়াইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্কিম শৈবলিনীর এই মানস-পাপের যে আশ্চর্য্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধান করিয়াছেন, তাহার অনুভূতির মধ্যে অনুতাপের যে প্রখর বহ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছেন, তাহা আমাদের বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে বিভীষিকাময় নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, ও এক সূক্ষ্মতর অমোঘতর বিচার-বিধানের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছে। 'চন্দ্রশেখর' পাঠের পর আমাদের কণ্ঠাগ্রে শেক্সপীয়রের সেই অমর উক্তি There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio উচ্চারিত হইতে থাকে। দাম্পত্য-কলহ আমাদের সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, এবং এক প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে ইহাকে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই প্রচলিত প্রবাদবাক্যের নিরসন করিয়াছেন। যে কেহ নগেন্দ্রনাথের অনুতাপদিগ্ধ বিরহ-ব্যাকুলতা, ভ্রমরের অভিমান-দুর্ব্বিষহ দীর্ঘ-প্রতীক্ষার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আর এই লঘু প্রবাদবাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন না। দীর্ঘ দাম্পত্য-প্রেমের পর নগেন্দ্রনাথের ও গোবিন্দলালের প্রলোভন ও পদস্খলন মানব-মনের দুর্জ্ঞেয়তা, নানা বিরোধী শক্তির সমবায়-ফলে ইহার চাঞ্চল্য ও আদর্শচ্যুতি, আকর্ষণের প্রবলতা ও মোহভঙ্গের তীব্রতা সম্বন্ধে এক অভিনব আলোকপাত করে। এইরূপে বঙ্কিমের প্রত্যেক উপন্যাসই আমাদের উপেক্ষিত অবজ্ঞাত মানব-জীবনের উপর এক অপরূপ অর্থ-গৌরব ও ভাব-মাহাত্ম্যের আরোপ করিয়াছে, বাস্তার ধূলিকণার উপর স্নিগ্ধ সমবেদনার শিশিরবিন্দু-সম্পাতে ইহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। উপন্যাসের এই উচ্চতর পর্য্যায়ে

উন্নয়নই বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—তাঁহার হাতে উপন্যাস অখ্যাত জীবনযাত্রার বিবৃতি হইতে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' কেবল ভাবসর্ব্বস্ব, কল্পনা-বিলাসীর উচ্ছ্বাসোক্তি নহে, তিনি সাধারণ জীবনের নিগূঢ় মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমগ্র দেশের মধ্যে মাতৃমূর্ত্তির বিরাট সাঙ্কেতিকতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আঁকিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের গর্ভধারিণীকে ও রত্নপ্রসবিনী রত্নসিংহাসনারূঢ়া মূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কালজয়ী মহামন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে তাহার ভিত্তিস্বরূপ তাঁহার প্রতিভার অপর দিকটাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনামার্গের নির্দ্দেশক ও সিদ্ধির উত্তরসাধক।*

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"...যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে—বাছিয়া বাছিয়া গোলাব, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে ছোলা-মটরের চাষ;—হারাধন পোদ গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইয়া নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।"

* বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পাইকপাড়া রাজবাটী অধিবেশনে পঠিত।

ভূয়োদর্শন

(১২)

গভীব অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা কবিতেছিলাম।

সাহিত্য-চর্চ্চা যখন কবি তখন বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে চিন্তিত না হইয়া উপায় নাই। সুতরাং চিন্তা কবিতেছিলাম। চিন্তা কবিতেছিলাম, প্রবন্ধ না লিখিয়া বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসব কি অন্য কোন সতুপায়ে সুসম্পন্ন কবা যায় না? বঙ্কিমচন্দ্রেব রচনাবলী বিশ্লেষণ কবিয়া বাগবিস্তাব করিতেই হইবে? ভাগীবথীব সলিল বিশ্লেষণ কবিয়া ভগীবথের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন!—কেমন যেন মনঃপুত হইতেছে না। বঙ্কিম-সাহিত্যেব উপব প্রবন্ধ লিখিয়া লাভ কি? যাঁহাবা সাহিত্য-বসিক তাঁহাবা বঙ্কিম-সাহিত্যবস পান কবিয়া তৃপ্ত হইযাছেন অথবা হইবেন। প্রবন্ধ রূপ ফিডিং বট্‌লেব তাঁহাদেব কোনই প্রযোজন নাই। আব যাঁহাবা সাহিত্য বসিক নহেন, সত্যকাব বসবোধ যাহাদেব নাই, প্রবন্ধ গিলাইযা তাঁহাদেব সুবসিক কবিযা তোলা অসম্ভব। অন্ধকে হাত ধবিযা মনুমেণ্টেব উপব চডাইয়া দিলেই তাহাব দৃষ্টি দিগন্তপ্রসাবী হইযা উঠে না। অরসিক পাঠক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ গলাধঃকবণ কবিয়া সাধাবণ দর্শকেব মনে আতঙ্ক অথবা বিস্ময় সঞ্চাব কবিতে পাবেন বটে, কিন্তু দ্রষ্টাকে প্রভাবিত কবিতে পারেন না। প্রভাবিত কবিতে পাবেন না, কিন্তু বিব্রত কবিতে পাবেন। চতুর্দ্দিকে পাণ্ডিত্যের জ্বালায় অস্থিব হইয়া উঠিয়াছি। সাহিত্য-কানন ইডেন গার্ডেন না হইয়া কিচেন গার্ডেন হইয়া উঠিল। রসিকচুডামণি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসবে আর লাউ, কচু, কুমডা, কদলী আমদানি করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।

প্রতিভাবান প্রবন্ধ-লেখককে ভয় করি না। ভয় করি প্রবন্ধ-আস্ফালককে। কোন মনীষী-ময়ূরের পক্ষে দুই চারিটি প্রবন্ধ-পালক ত্যাগ করা অসম্ভব অথবা অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু পুরাতন সেই গল্পটি মনে উদিত হইলে স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা করে—হে ময়ূরগণ, ভগবৎ-প্রসাদে তোমরা নয়নরঞ্জন পালকের অধিকারী হইয়াছ স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, তোমরা ইচ্ছা করিলেই দুই চারিটি পালক ছাড়িতেও পার, কিন্তু দোহাই তোমাদের, যেখানে সেখানে এবং যখন তখন পালক-মোচন করিও না। কারণ পৃথিবীতে দাঁড়কাক আছে।

আর একটা কথাও বিবেচ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ-বাজি অথবা গলা-বাজি করিলে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা নিজেকেই কি বেশি জাহির করা হয় না? যেমন দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতি বৎসর হারু পোদ্দার কাড়া-নাকাড়া-দামামা পিটাইয়া আত্মঘোষণা করেন, দেশসেবা উপলক্ষে যেমন খ্যাত অখ্যাত খদ্দরধারী কত আত্ম-প্রচারক নানা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া স-নির্ঘোষে নিজেদের ও দেশসুদ্ধ লোককে ঘর্ম্মাক্ত করিয়া তোলেন, ক-বাবুর ছেলের বিবাহ উপলক্ষে অথবা খ-বাবুর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া গ-বাবুর পত্নী অথবা ঘ-বাবুর কন্যা যেমন নিজেদের বস্ত্র-অলঙ্কার-রূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া বেড়ান—আমরাও কি সেইরূপ বঙ্কিমের জন্মতিথিকে উপলক্ষ করিয়া নিজেদের বিদ্যা-আস্ফালন করিতে থাকিব?

অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, থাকিব—আলবৎ থাকিব। সাহিত্য-চর্চ্চা করি বলিয়া আমরা মনুষ্যধর্ম্মচ্যুত হই নাই। মনুষ্যোচিত সমস্ত দুর্ব্বলতা আমাদের আছে, এবং আমরা এ সুযোগ কিছুতেই উপেক্ষা করিব না। করিবার হেতু কি থাকিতে পারে? মন কিন্তু

বলিতে লাগিল, আর যাই কর, প্রবন্ধ লিখিও না। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মনিশীথে ছাদের উপর বসিয়া নানা রঙের বড় বড় ফানুস ছাড়। অন্ধকার মহাশূন্যে লাল, নীল, পীত, হরিৎ—নানা বর্ণের একশত ফানুস সারি সারি উড়াইয়া দাও। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া অন্ধকারের বক্ষে আলোর আলিপনা আঁক। আলো কিছুক্ষণ পরে নিভিয়া যাইবে। তোমার প্রবন্ধই কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে? আজিকার দিন পাণ্ডিত্য-প্রকাশ করিবার দিন নয়, সকলে মিলিয়া আনন্দ-প্রকাশ কর। রোমে যেমন কার্নিভাল উৎসব হইত, তেমনই একটা উৎসবের অনুষ্ঠান কর না কেন? বহুবর্ণ-বিচিত্রিত পরিচ্ছদে মাংসময় দেহটাকে আবৃত করিয়া কৃত্রিম ছদ্মবেশে নিজেদের কৃত্রিমতর ঝুটা ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া সকলে আজ রাজপথে বাহির হইয়া পড়। সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়ুক, সমস্ত বাধা সরিয়া যাক। মহানন্দে আজ সকলে উৎসবে মাতিয়া উঠ। হেদুয়া-পুষ্করিণীর জল তুলিয়া ফেলিয়া রক্তের মত গাঢ় লাল রঙে তাহা পরিপূর্ণ কর। এমন দিনে আষাঢ় মাসে হোলি খেলিলেও অশোভন হইবে না। গোলদীঘিতেই বা জল থাকিবার প্রয়োজন কি? উৎকৃষ্ট সুরায় তাহা কানায় কানায় ভরিয়া দাও। পার্কে পার্কে রূপের হাট বসিয়া যাক, মাঠ ঘাট বাট আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া—বক্তৃতা নয়—একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন কর। দেশের সমস্ত আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দাও। লকলকায়িত অনলশিখা গগনস্পর্শী হইয়া উঠুক। তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ। প্রবন্ধ লিখিয়া কি হইবে?

উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পড়িল।

দ্বারপ্রান্তে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিল। শীর্ণকান্তি প্রৌঢ় একটি

ব্রাহ্মণ। পরিধানে অর্দ্ধমলিন বস্ত্র, পায়ে ধূলিধূসরিত চটি, হস্তে থেলো হুঁকা। নগ্নগাত্রে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ শোভা পাইতেছে। কোটরগত চক্ষু দুইটি উন্মীলিত, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন নহে। কেমন যেন তন্দ্রাতুর—স্বপ্নাচ্ছন্ন।

যদি অনুমতি করেন প্রবেশ করি।

আসুন আসুন, বসুন। কি চান আপনি?

ব্রাহ্মণ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, দেখুন, চাহিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। সরলভাবে আজকাল কেহ কিছু চাহে না, সরলভাবে কেহ কিছু দেয়ও না। বর্ত্তমান কালে প্রার্থী মানেই ভেকধারী, দাতা মানেই নির্ব্বোধ। দাতা-গ্রহীতার মধুর সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সে দিন আর নাই, যখন দাতা দান করিয়া ধন্য হইত এবং গ্রহীতা দান গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিত, এবং উভয়েই তাহা সরলভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং আজকাল প্রকৃত প্রয়োজন থাকিলেও চাহিতে ভরসা হয় না।

সঙ্কোচভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তো—

মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজন থাকে। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই পরের প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থ্য, সুযোগ অথবা সহৃদয়তা থাকে না। বর্ত্তমানে আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা আধ্যাত্মিক নহে, নিতান্তই আধিভৌতিক। সেইজন্য ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হইতেছি। অর্থাৎ আমি কিছু অর্থ-সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছি।

আমি নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।

ব্রাহ্মণ বলিয়া চলিলেন, আপনার আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করিলেও করিতে পারেন।

প্রথমেই আপনাকে জানাইয়া দিতেছি যে, আমি নিজের জন্য কখনও কাহারও নিকট অর্থ-ভিক্ষা করি নাই, আজও করিতেছি না। আজ আপনারা বঙ্কিম-শতবার্ষিক উৎসব করিতেছেন। আমিও আজ সেই উৎসব করিব। কিন্তু আমি নিজের মত করিয়া করিব।

উৎসাহিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি রকম?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই উৎসব উপলক্ষে একটি বিবাহ ও একটি ভোজ আমি দিতে চাই। আপনারা যে ভাবে উৎসব করিতেছেন, তাহা আমার মনঃপূত হইতেছে না। কিন্তু আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার কল্পনা আছে, কিন্তু অর্থ নাই। আপনারা যদি সাহায্য করেন, আমার কল্পনাকে রূপ দিতে পারি।

লোকটা পাগল নয় তো!

প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না, বিবাহ? কাহার বিবাহ?

ফুলের বিবাহ। সত্য সত্যই আজ মহাসমারোহে মল্লিকার সহিত গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। আপনারা কি দেখিতে পান না—আজকাল শত শত মল্লিকা ফুটিয়া ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, শত শত গোলাপ বিশুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে? তাহাদের বিবাহ আজকাল আর হয় না। হইবার উপায় নাই। বঙ্কিমের জন্মতিথি-উৎসবে আমি মহাসমারোহে একটি মল্লিকার সহিত একটি গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। কিন্তু তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেকালে মল্লিকার সহিত গোলাপের বিবাহ দিতে গেলে বিশেষ কিছু খরচ হইত না। ভ্রমর ঘটকালি করিত, উচ্চিঙ্গড়া নহবত বাজাইত, মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইত, খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিত, আকাশে তারাবাজি হইত, কোকিল আগে আগে ফুকরাইত। সর্ব্বশেষে একখানি কোমল হস্ত তাহাদের তুলিয়া লইয়া একসূত্রে একমালায় গাঁথিয়া দিত। কিন্তু এখন

সে সব দিন আর নাই। ভ্রমর, উচ্চিঙ্গড়া, মৌমাছি, খদ্যোত, কোকিলরা মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পায় না। চারিদিকে পাকা বাড়ি, পাকা রাস্তা, চতুর্দ্দিক প্রস্তরময়। সব শান-বাঁধানো—এতটুকু ঘাস গজাইবার উপায় নাই। সমগ্র সভ্য সমাজ মৃত্তিকাহীন। মল্লিকা ও গোলাপ বহুস্থানে টব আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। আজিকার দিনে মল্লিকার সহিত তাই গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। তাহাদের বড় দুঃখ। উৎসবের দিনে দুঃখীরাই যদি সুখ না পাইল, তবে কিসের উৎসব? শহরের যত আলো ও যত বাজনা আছে সমস্ত একদিনের জন্য ভাড়া করিয়া, একটি মল্লিকার সহিত একটি গোলাপের বিবাহ দিয়া আজিকার উৎসব সার্থক করিতে চাই। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন?

আমার মুখে কথা সরিতেছিল না।

পরস্পরের দিকে চাহিয়া উভয়েই কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে প্রশ্ন করিলাম, ভোজ দিবেন কি বিবাহ উপলক্ষেই?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, না। বিড়াল-ভোজন করাইব।

বিড়াল-ভোজন?

হাঁ, বিড়াল-ভোজন। বিড়ালদেরও আজকাল বড় দুঃখের দিন আসিয়াছে। তাহাদের সকরুণ মেও মেও ধ্বনি কি শুনিতে পান না? শুনিতে পান না কি—তাহারা দিবারাত্রি বলিতেছে, "আমাদের দশা দেখ। আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্যে মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ

হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে, কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই"? বুভুক্ষু বিড়ালদের এ ক্রন্দন শুনিতে পান না কি? দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট বিড়ালদের সংখ্যা আজকাল খুব বাড়িয়াছে। আজিকার এই উৎসবের দিনে—অন্তত একটা দিনের জন্যও—প্রাণ ভরিয়া তাহাদের খাওয়াইতে চাই। কিন্তু আমি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ। আপনারা যদি অর্থসাহায্য করেন, তবেই আমার বাসনা চরিতার্থ হয়। আজ আপনারা সকলে হুজুগে মাতিয়াছেন, সেইজন্য ভরসা হইতেছে যে, উপযুক্ত স্থানে নিবেদন করিলে হয়তো আমার আশা ফলবতী হইতে পারে। কারণ হুজুগে না মাতিলে বাঙালী কিছুই করে না। আমার বক্তব্য তো বলিলাম। কিছু সাহায্য করিবেন কি?

বলিলাম, আপনার প্রস্তাব খুবই উত্তম। কিন্তু আমার একার সাধ্যে কুলাইবে না। বন্ধুবান্ধবদের নিকট চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি সংগ্রহ করিতে পারি।

ব্রাহ্মণ উঠিয়া পড়িলেন।

ভাল কথা, আমিও আরও কয়েক স্থানে চেষ্টা করিয়া দেখি।—এই বলিয়া তিনি গমনোন্মুখ হইলেন।

প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না, আপনার নামটা জানিতে পারি কি?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

পরমুহূর্ত্তেই দ্বারপথে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আমি বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

দড়াম করিয়া শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম।

জানালাটা সশব্দে খুলিয়া গেল।

বাতায়ন-পথে দেখিলাম, আষাঢ়-গগনে মহিমাময় মেঘ-সমারোহ। বিদ্যুত স্ফুরিত হইতেছে। খরবেগে বাতাস বহিতেছে। ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে আষাঢ় মাসের এমনই এক রজনীতে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতকার লিখিতেছেন—সেদিন আকাশ নিৰ্ম্মল ছিল। ছিল কি?

ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আমার যে কলিক হইয়াছিল তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন, ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার পর ঘুম হয়েছিল?

না, ঘুম হয় নি। তবে ব্যথাটা আর নেই।

মর্ফিয়া নিয়েও ঘুম হ'ল না আপনার? আশ্চর্য্য তো! আচ্ছা, এই ওষুধটা খাবেন তা হ'লে।

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মর্ফিয়া!

তীক্ষ্ণসূচিমুখে কমলাকান্তের প্রেতাত্মা শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন বুঝিলাম।

একটু পরে নাতি আসিলেন।

খান দুই বাঁধানো বই আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, এখানকার

লাইব্রেরিতে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী সব নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে এইগুলো পেলুম। প্রবন্ধগুলো একেবারে নেই।

আমি এককালে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত পুস্তকই খরিদ করিয়াছিলাম। কে কোথায় লইয়া গিয়াছে, বাড়িতে এখন একখানাও নাই। নাতিকে সেজন্য স্থানীয় পাঠাগারে পাঠাইয়াছিলাম।

নাতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভূতে বিশ্বাস করিস?

হঠাৎ ভূতের কথা কেন?

বল না, করিস কি না?

নিশ্চয়ই না।

সেইজন্যেই তোদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

একটু হাসিয়া নাতি ভিতরে চলিয়া গেল।

বসুমতী-সংস্করণের কীটদষ্ট পীতাভ পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য, মাত্র একশত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ—

শুইয়া শুইয়া 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িতেছিলাম।

"সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল, নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল, কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল, গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্য-বীথিকায় দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না, পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল, সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা

করিয়া কাঁদিল, শিশু বিনা রোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল! গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার ”

পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

স্বপ্নে আবার কমলাকান্ত আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। বলিলেন, আমার অত টাকার আর প্রয়োজন নাই। কোন রকমে গয়ার ভাড়াটা জোগাড় করিয়া দিতে পারেন?

কেন?

পিণ্ড দিব।

সেকি! কাহার?

সকলের। খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কেহ বাঁচিয়া নাই।

ঘুম ভাঙিয়া গেল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, ঘনকৃষ্ণ মেঘের স্তর ভেদ করিয়া বঙ্কিম চন্দ্র উদিত হইতেছেন। আর্দ্র ধরণী জ্যোৎস্না-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পত্রে পত্রে, তৃণে তৃণে, তরঙ্গে তরঙ্গে, সৌধশীর্ষে, কুটীর-প্রাঙ্গণে আলোকের জয়ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

“আমি আছি। সমস্ত মেঘ সত্ত্বেও আমি আছি।”

কে এ কথা বলিল?

আকাশবিহারী বঙ্কিম চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছেন।

অদ্ভুত অট্টহাস্য!

দেখিলাম, নিরুদ্ধ হাস্যবেগে তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে রজতসন্নিভ ধবলকান্তি রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তূপে আগুন লাগিয়াছে।

সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, এ তো চন্দ্র নহে—এ যে সূর্য্য।

অন্ধকার সরিয়া যাইতেছে।

সভয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলাম—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

* * *

ঠিক করিয়াছি, আফিং ধরিব।

"বনফুল"

"...আমি তখনও একা, এখনও একা, কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একায় এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম, কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি, যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি-সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি।...এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে, পিণ্ডদান কেন?"

জাতীয় সঙ্গীত

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ১২৮৭ সালের চৈত্র মাস হইতে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়, কিন্তু রচয়িতার জীবদ্দশায় 'বন্দে মাতরম্' গীতটির প্রয়োগ বিশেষ কিছু হয় নাই। ইল্‌বার্ট বিলের প্রতিবাদে যে আন্দোলন হয়, তাহাতে 'বন্দে মাতরম্' কেহ গান করে নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস-আদেশে ছাত্রমহল যখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও ইহা শোনা যায় নাই। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়, সেই সময় প্রথম বাঙ্গালীরা মাতাকে সহস্রকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া প্রণাম করিল। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে যে ঐক্যের সন্ধান মিলিল, তাহা বাঙ্গালীর এবং ভারতবাসীর পক্ষে এক অদ্ভুত গণশক্তির প্রতিষ্ঠা করিল।

তারপরে, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর যখন মহাত্মা গান্ধি সমগ্র ভারতে এক অভূতপূর্ব অসহযোগের দাবানল জ্বালিয়া দিলেন, তখন সকল কোলাহলের ঊর্ধ্বে ধ্বনিত হইয়াছিল—'বন্দে মাতরম্'। এই মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে অসংখ্য নরনারী হাস্যমুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করিল।

তখন হইতে বাঙ্গালীর সঙ্গীত—আধ-বাংলা আধ-সংস্কৃতে লিখিত গান—ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল। যে আধ-বাংলা আধ-সংস্কৃতে লেখা * বলিয়া আমাদের জাতীয় কবি নবীনচন্দ্র একদিন ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা পরিণামে দোষের না

* বৈষ্ণব কবিতায় এইরূপ আধ-বাংলা আধ-সংস্কৃতে লিখিবার রীতি মাঝে মাঝে দেখা যায়, যথা—'অধরে হাসি করেতে বাঁশি শোভম্'—শশীশেখর।

'অতিভদ্রং অতিভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা'—গোকুলানন্দ।

হইয়া গুণের মধ্যেই গণিত হইল। কেন না, এই সংস্কৃতের মিশ্রণ থাকার জন্য বঙ্গের বাহিরের লোকের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা সহজ হইয়াছে। ভারতের সকল প্রদেশেই সংস্কৃতের চর্চা অল্পবিস্তর আছে।

দেখিতে দেখিতে এই মহাগীত ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল, 'বন্দে মাতরম্' লেখা সার্থক হইল। আর একটি সঙ্গীতের ভাগ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধ ঘটিযাছিল। ফরাসী বিদ্রোহের সময়ে (১৭৯২) Rouget de Lisle নামে একজন ফরাসী সৈনিক La Marseillaise সঙ্গীতটি রচনা করেন। রাতারাতি সে সঙ্গীত বিদ্রোহী ফরাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িযাছিল এবং তাহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে কার্লাইল বলিয়াছেন যে, এমন সঙ্গীত আর হয় নাই। *

ঐ সঙ্গীতের আরম্ভ এইরূপ: ফরাসী সন্তান, জাগো জাগো! তোমাদের পুত্রকলত্র পিতৃপিতামহের অশ্রুধারা ঘুচাও। ঐ শোন, তাহাদের করুণ ক্রন্দন। ঘৃণিত অত্যাচারীর দল তোমাদের দেশ পদদলিত করিতেছে, শান্তি ও স্বাধীনতা আজ শোণিতলিপ্ত হইয়া ম্রিয়মাণ, তোমরা কি নিশ্চিন্ত থাকিবে? বীরগণ, সাজো সাজো; নিষ্কাষিত কর তোমাদের শাণিত তরবারি, লও প্রতিহিংসা। দৃঢ়পণে হও আগুয়ান, হোক জয়, হোক মৃত্যু।

এই জগদ্বিখ্যাত গানের মধ্যে আছে বিদ্রোহ, জ্বলন্ত প্রতিহিংসার শিখা ও উন্মত্ত শোণিতলিপ্সা। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে সে সকল কিছুই নাই; তবুও ইহার dangerous meaning † সাত সাগরের

---

* "the luckiest musical composition ever promulgated, the sound of which will make the blood tingle in men's veins, and whole armies and assemblages will sing it with eyes weeping and burning, with hearts defiant of Death, Despot and Devil."—Carlyle.

† London Times.

ঢেউ অতিক্রম করিয়া বিচলিত করিল আমাদের বিলাতী বিধাতা-পুরুষগণকে।

ফরাসীরা এইভাবে জাতীয় সঙ্গীতের রক্তটীকা ললাটে ধারণ করিয়া বহ্নিদীক্ষা গ্রহণ করিল। ইংরেজের জাতীয় সঙ্গীত অনেকটা মৃদুভাবাপন্ন। তাহারা রাজার জয় কামনা করিয়া জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছে। ইংরেজের ইতিহাস সব সময়ে ঐকান্তিক রাজভক্তির প্রতি পক্ষপাত না দেখাইলেও তাহাদের এই অদ্ভুত জাতীয় সঙ্গীত কিন্তু রাজভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন। এ গানের প্রধান গুণ এই যে, প্রথমেই ভগবানের আবাহন থাকায় সকলের পক্ষেই ইহা গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। ইহার কথা যেমনই হউক, সুর অনবদ্য। এরূপ জনপ্রিয় সুর আর নাই। অনেক দেশের জাতীয় সঙ্গীত এই গানের সুর অবলম্বন করিয়াছে। 'বন্দে মাতরমে'র রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সংযোজিত সুরেও যে এই সুরের ছায়া পড়ে নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

জার্মানদের জাতীয় সঙ্গীত "Deutschland ueber alles, ueber alles in der Welt"—এই গানটিও জন্মভূমির উদ্দেশে রচিত। জার্মানি পৃথিবীর মধ্যে সকল দেশের সেরা, সকল দেশের প্রভু—এই অর্থ।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত তুলনা করিলে মনে হয় যে, আমাদের 'বন্দে মাতরমে'র মত মনোরম, নির্দোষ, কবিত্বপূর্ণ, মর্মস্পর্শী সঙ্গীত আর কোনও দেশে নাই। অবশ্য আমাদের সঙ্গীত আমাদের কানে তো সুধা বর্ষণ করিবেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিলে সকলেই ইহার মিষ্টত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই অদ্ভুত সঙ্গীত রচনার প্রেরণা কোথা হইতে পাইলেন? এই প্রেরণার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, সে যুগে ফরাসী বিদ্রোহের বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও, রুসো ভল্‌টেয়ার

প্রভৃতির মতবাদের প্রতি লোকের আগ্রহ তখনও কমে নাই। তাঁহাদের সাম্যবাদ, স্বাধীনতা-স্পৃহা তখনও জনমন আন্দোলিত করিতেছিল। এদেশে নীলকরের উৎপীড়নের বিভীষিকা বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করিবার সুযোগ যে না পাইযাছিলেন, এমন মনে হয় না। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্কিম নিশ্চয়ই অনুভব করিয়াছিলেন। তারপরে ভারতবর্ষে সিপাহী-যুদ্ধের যে ঝঞ্ঝা বহিয়াছিল, তাহারই আবর্তের মধ্যে বঙ্কিমের উন্মেষিত যৌবনের প্রারম্ভ কাটিয়াছিল। এই সকল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জাতীয়তার ভাব তীব্রভাবে প্রস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সে সময়ের সাহিত্যেও আমরা ইহার অঙ্কুর দেখিতে পাই। কিন্তু উষার আলো ও আঁধার অতিক্রম করিয়া প্রভাতারুণ দেখা দিল বঙ্কিমের অপূর্ব পরিকল্পনায়—নানা রঙে বিচিত্র, সুন্দর বিদগ্ধ হইয়া। বঙ্কিম যে এই জাগরণের অগ্রদৌত্য করিলেন তাহা নহে, তিনি যে রঙ্গলালের ন্যায় কবিরূপে তাহার মহিমা গায়িলেন তাহাও নহে, তিনি হেমচন্দ্রের ন্যায় জাতির জড়তারূপ যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাও নহে, তিনি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষির ন্যায় ভবিষ্যতের আঁধার গর্ভ হইতে মাতৃমূর্তির উদ্ধার সাধন করিলেন। তাই তাঁহার গান হৃদয়-তন্ত্রীর দুই একটি তারে আঘাত করিয়া নিরস্ত হয় নাই। সবগুলি তারে ঝঙ্কার দিয়া সুরের সুদূরব্যাপী তরঙ্গ তুলিয়াছিল। 'আনন্দমঠে' দেশভক্ত সন্তানেরা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি অবান্তর ঘটনা মাত্র। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' উপলক্ষ মাত্র। বেচারী অত্যাচারী নবাব নিমিত্ত মাত্র। 'আনন্দমঠে'র দেবতা—স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি; ইহার ধর্ম—স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশসেবা;

ইহার সেবকগণ সব—সন্তান , রক্ষক—বৈষ্ণবী সেনা। বিগত শতাব্দীর দুরবস্থা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, অরাজকতা উপলক্ষ করিয়া বঙ্কিম এই 'আনন্দমঠ' গড়িয়াছিলেন। তাহা না করিলে, তাঁহার চাকরি যাইত, তাঁহার 'আনন্দমঠ' রাজেযাপ্ত হইত। *

এ কথাটি আমরা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আজ 'আনন্দমঠে'র অগ্নিসংকার হইতেছে। 'বন্দে মাতরমে'র অঙ্গচ্ছেদ হইতেছে।

'বন্দে মাতরমে'র কয়েকটি কলি পৌত্তলিকতার অপরাধে বাদ পড়িতে চলিয়াছে। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা কয়েকজন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম—তিনি তখন রাষ্ট্রপতি না হইলেও মহাত্মার বামহস্তস্বরূপ ছিলেন। কাজেই রামানন্দবাবু প্রভৃতি আমরা কয়েকজন তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ন্যায্য হয় নাই। কিন্তু বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ইহাকে পৌত্তলিকতাগন্ধী বলিয়া যখন অভিমত দিয়াছেন, তখন আর আমাদের চেষ্টায় কি হইবে? রামানন্দবাবু কিন্তু ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হইলেও আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। নব্যবঙ্গের কবি ও পুরোহিত, স্বদেশমন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক রবীন্দ্রনাথ কেন যে এমন অভিমত দিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

আমি সে সময়ে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এই: পৌত্তলিক হিন্দু তেত্রিশ কোটী দেবতাকে সরাইয়া তাহাদের সেই শূন্য সিংহাসনে জন্মভূমিকে বসাইতে সম্মত হইবে কেন? 'আনন্দমঠে'র সন্তানদের

---

* প্রথম সংস্করণে 'আনন্দমঠে'র শেষে ছিল: "...সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল , নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।" এই অংশ পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বঙ্কিম যে কথা বলেন নাই, ইতিহাস তাহা বলিয়াছে।

নিকট এই জন্মভূমিই জননী, ধর্মদেবতা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সব। কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিন দুর্গাপ্রতিমা দেখিয়া 'মা-মা' বলিয়া ডাকিতেছেন বটে, কিন্তু কমলাকান্তের মা শরতে পূজিতা গিরিনন্দিনী উমা নহেন। রূপকের সাহায্যে কমলাকান্ত দেশমাতৃকার যে সুন্দর বন্দনা করিয়াছেন, তাহাতে পৌত্তলিকতা কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে যদি পৌত্তলিকতা হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ যখন লিখিলেন—

"চাইনা তোদের সভ্যতার এ আলোক
যদি হতে পারতাম ব্রজের রাখাল বালক।"

তখন তাঁহাকেও ব্রাহ্মসমাজ হইতে নাম কাটাইয়া বৈষ্ণবের তিলককণ্ঠী পরাইয়া দেওয়া উচিত ছিল।

'বন্দে মাতরম্' গানের মধ্যে যে হিন্দুর দেবদেবীর উল্লেখ আছে, তাহার কারণ বঙ্কিমবাবু হিন্দু আবেষ্টনের মধ্যে হিন্দু সন্ন্যাসীদের মুখ দিয়া এই স্তোত্র বলাইয়াছেন। ইহা সাধারণ সঙ্গীত নহে—ইহা স্তব—স্তোত্র। কিন্তু হিন্দু মহেন্দ্র ঠিকই বলিয়াছিলেন, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়।" বঙ্কিম প্রচলিত অর্থে হিন্দু ছিলেন কিনা জানি না, তবে তাঁহার মত যে হিন্দুধর্মের একান্ত অনুকূল নহে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, "স্বদেশপ্রীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।" এই ধর্ম অবশ্য নূতন। কোমতের মনুষ্যপ্রীতি-ধর্ম তবু কতকটা আমাদের প্রাচীন ধর্ম না হউক চারিত্র-নীতির অনুগামী। কিন্তু এই দেশপ্রীতি-ধর্ম নবজগতের নূতন ধর্ম। বিদেশে ইহার নাম Patriotism; আমাদিগের নূতন নাম গঠন করিয়া লইতে হইয়াছে—দেশভক্তি, স্বদেশপ্রীতি, স্বাদেশিকতা। এখন

আবার পশ্চিমে স্বদেশপ্রীতির আসন রাষ্ট্রপ্রীতি কাড়িয়া লইতেছে। মাতৃভূমি নয়, রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই পরম দেবতা।

যাহা হউক, বঙ্কিম সন্তানদের মুখ দিয়া প্রচার করিয়াছেন—জাগ্রত স্বদেশপ্রীতি। মুসলমান নবাবের অত্যাচার আবরণ মাত্র। হেমচন্দ্রকেও এইরূপ 'আবরণ' অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তাঁহার 'ভারতসঙ্গীত' তিনি দিয়াছেন এক রাজপুত চারণের মুখে। প্রচ্ছন্নতার এই কৌশল নবযুগের বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা বুঝিয়াছিল, আর বুঝিয়াছিলেন কর্ত্তৃপক্ষেরা। তাই পুলিস সে যুগে 'আনন্দমঠ' পাইলেই কাড়িয়া লইয়া যাইত।

'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীরা উৎপীড়িত বঙ্গভূমির দুঃখ-দুর্দশা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহাদের গীতি বঙ্গজননীর উদ্দেশেই উচ্চারিত হইয়াছিল। আজ ইহাকে সারা ভারতের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য দুই এক স্থলে ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সমগ্র ভারতের পক্ষেই ইহার প্রয়োগ। ওয়ারেন হেস্টিংসের দিনে যাহাই হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের দিনে দেশ বলিতে শুধু বঙ্গ বুঝাইত না। বঙ্কিম গীতটি এমনভাবে রচনা করিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতকে বুঝাইতে কোনও বাধা হয় না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানে বাংলা দেশকেই বিশেষভাবে বন্দনা করা হইয়াছে। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' গানে সংখ্যা ব্যতীত এমন কথা একটিও নাই যাহা কেবল বঙ্গদেশ সম্বন্ধেই প্রযোগ্য। এইজন্য এক দিকে যেমন ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা নাই, অন্য দিকে তেমনই প্রাদেশিকতার প্রসঙ্গও আসিতে পারে না। সপ্তকোটীর স্থলে ত্রিংশ কোটী এবং দ্বিসপ্ত কোটীর স্থলে দ্বিত্রিংশ কোটী বলিলে আর কোনও বাধাই থাকে না। সেইজন্য বলিয়াছি যে, সকল দিক দিয়া বিচার করিলে এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গীতের তুলনা হয় না।

তবে গোল হইয়াছে এই যে, ইহার অর্থ সকলে হয়তো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আমাদের বিলাতী বিধাতাপুরুষেরা একদিন মনে করিয়াছিলেন যে, ইহা হিন্দুর দেবতা করালী কালীর উদ্দেশে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র ডাকাতদের মুখে এই গীতটি দিয়াছেন, তাহারই জন্য সম্ভবত তাহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। * আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা মনে করিতেছেন যে, ইহা দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার উদ্দেশে রচিত। কিন্তু আমাদের দেশজননী শুধু দুর্গা নহেন, তিনি কমলা, লক্ষ্মী, ঐশ্বর্যময়ী, তিনি বাণী বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী। শুধু তাহাই নহে, তিনি আমাদের দেহে প্রাণস্বরূপিণী। ইংরেজের কামান-শ্রেণী যখন সংহার-কার্যের জন্য সজ্জিত হইয়াছে, তখন বৈষ্ণবী সেনা গাহিল—

তুমি বিদ্যা, তুমি ভক্তি
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। †

আমাদের জননী কোন দেবতাবিশেষ নহেন, তিনি সকলের প্রাণ। প্রাণ জীবজগতের সব, প্রাণের অভাব ঘটিলে সবই অসার, সবই অসাড় মৃত জড়। সেইজন্য বৈদিক যুগে চাক্রায়ণ ঋষি যজ্ঞস্থল হইতে পুরোহিতদিগকে উঠাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, আমি কোনও দেবতার

* J. D. Anderson

† মূল গানে আছে ঃ তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বিপদের সম্মুখীন হইয়া বৈষ্ণবী সেনা গান ভুলিল, কিন্তু অর্থ ভুলিল না। কি সুন্দর স্বাভাবিক!

উদ্দেশে যজ্ঞ করিব না, যদি যজ্ঞ করিতে হয় তো প্রাণান্ হবামি।—আমি প্রাণেবই যজ্ঞ কবিব। কি তেজ, কি গরিমা! সেইরূপ বঙ্কিম দেবতাদেব বাজ্য অতিক্রম কবিয়া এক নূতন পূজার্হের সন্ধান পাইলেন। ইহাকে নূতন ধর্ম বলিতে চাও, বল, কিন্তু ইহা হিন্দুধর্ম নহে। হিন্দুবা মন্দিবে মন্দিবে এই দেশমাতৃকাব প্রতিমা গড়ে না, কখনও গড়িবে কিনা জানি না। এ ধর্ম মাযের সন্তানেব ধর্ম, দেশভক্ত সহস্র লক্ষ নিযুত কোটী নবনাবীব ধর্ম। হিন্দু হও, খৃষ্টান হও; মুসলমান হও, আস্তিক হও, নাস্তিক হও, সকলেই এই দেশভক্তিব মন্ত্র স্বীকার করিতে পাব, দেশজননীকে পূজা কবিতে পার, দেশসেবা জীবনের ব্রত বলিয়া অঙ্গীকাব কবিতে পাব। এখানে সাম্প্রদাযিকতা কোথায? হিন্দু হিন্দুব ভাযায বলুক ও মুসলমান মুসলমানেব ভাষায বলুক—অর্থ ঠিক থাকিলেই হইল। হৃদয ঠিক থাকিলেই হইল। ইংবেজী মাস, বার পৌত্তলিক যুগেব দেবদেবীব নাম স্মবণ কবাইযা দেয, তাহাতে কি? তাহাদেব ঠিকে ভুল হয না। নিজেবা দিশাহাবা না হইলেই হইল।

সেইজন্য এই মহাগীতেব অঙ্গচ্ছেদে আপত্তি কবিযাছিলাম আমবা জনকতক সাহিত্যসেবী। কলকলনিনাদে নদী বহিযা চলিয়াছে—তাহাব তটভূমিব বৃক্ষবনানীচ্ছায়াব অভিনন্দন কবিতে কবিতে; তাহাকে কে বাধা দেয? সে স্রোত কে নিরুদ্ধ কবিতে চায়? তাহার স্রোত গেলে কি সেই কলধ্বনি থাকে? স্রোতেব সঙ্গে সে সঙ্গীত ভাসিযা চলিযাছে অনন্তেব অভিমুখে। 'বন্দে মাতবমে'ব অঙ্গহানি করিলে সে অর্থ থাকে না, সে সঙ্গীত থাকে না, সে সঙ্গতি থাকে না, সে উন্মাদনাও আসে না। কাজেই আমবা বলিয়াছিলাম, বাখিতে হয সমগ্রটা বাখ, না বাখিতে ইচ্ছা হয, অন্য গান দেখ।

কেন বলিলাম তাহা বুঝিতে হইলে গানটির মর্ম উপলব্ধি করা আবশ্যক। যে কয়েক ছত্র রাখিয়া দিবার হুকুম হইয়াছে, তাহা কেবল মাতার বহির্বঙ্গবর্ণনা। আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা,* শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী সুখদা বরদা ইত্যাদি। এ বর্ণনা সরস কবিত্বময়, তাহা মানি। কিন্তু ইহার মধ্যে শক্তি নাই, আবেগ নাই, দৃঢ়তা নাই, তেজ নাই। ইহা লইয়া আমরা কি করিব? হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত—যে গানের স্রোতে নরনারীকে ভাসাইয়া লইয়াছিল, তাহাদের কণ্ঠে দিয়াছিল গান, হৃদয়ে দিয়াছিল বল, প্রাণে দিয়াছিল প্রেরণা, সে গান কই? 'বন্দে মাতরম্' আমরা বুঝি নাই। 'বন্দে মাতরম্' ঘুম পাড়াইবার গান নহে, ইহা জাগরণের সঙ্গীত।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,—"

---

* মলয়জ শব্দের অর্থ অনেকে করিয়াছেন মলয়ানিল। কিন্তু মলয়জ শব্দের আভিধানিক অর্থ—চন্দন। যথা শিবায়নে 'মলয়জ মাখি।'

'মলয়' অর্থেই যখন মলয় পবন, তখন মলয়জ বলিবার তাৎপর্য কি? ভবানন্দ এক স্থলে বলিয়াছেন, 'মলয়জসমীরণশীতলা'। এখানে অর্থ—চন্দনগন্ধবাহী সমীরণ কর্তৃক শীতলীকৃত। চন্দন আমাদের ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোথাও জন্মে না। সুতরাং চন্দন অর্থ করিলেই সুসঙ্গত হয়। আমাদের বঙ্গদেশে দেবদেবীকে চন্দনানুলিপ্ত করিয়া গ্রীষ্মের প্রখর তাপে শীতল করা হয়।—'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী'। রাজা-রাজড়াদের মধ্যেও এ প্রথা ছিল। আমাদের জন্মভূমি চন্দনশীতলা।

বঙ্কিমের মাতৃপূজা

পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির সাহিত্য যে বিষয়বস্তুর ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে—সে বিষয়টি হইতেছে ধর্ম্ম। আদিম মানবজীবনে সংস্কৃতির গঠনকল্পে কল্পনার কেন্দ্রস্থলে একটি মেরুদণ্ডের প্রয়োজন ছিল। সেই মেরুদণ্ড মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও কল্পনা—ঈশ্বর। ঈশ্বরকে পাওয়ার কামনায় মানুষ তাঁহার স্তব রচনা করিতে করিতে একদিন আপনার অজ্ঞাতসারে রচনার মধ্যে রসের স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবন-দেবতার বাসভূমি গড়িয়া ফেলিল। এই রসের স্বর্গই সাহিত্য। সেই কারণেই পরবর্ত্তী কালে দেবতাকে রসময় বলিয়া শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছে, শুধু রসময় কেন, জীবন-দেবতাকে রসের স্বরূপ বলিয়া সাহিত্যকে ধর্ম্ম আপনার একান্ত নিজস্ব করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারও পরে বহু বহু অভিনব অনুভূতি-উপলব্ধির পর মানুষ সন্ধান করিল—সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য রস, ধর্ম্মসম্মত অথবা ধর্ম্মবিষয়ক কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াও সে রসের সৃষ্টি হইতে পারে। রসময় ধর্ম্মের গণ্ডি-ঘেরা স্বর্গ ব্যতীত অন্যত্র নাই বসতি করুন, রসের ব্যাপ্তি সীমায় আবদ্ধ নয়—রাজপুত্রের পক্ষীরাজের গতি অবারিত, তেপান্তরের মাঠ—সাতসমুদ্র পার হইয়া সে চলে।

বাংলা দেশেও সাহিত্যে আদিকালে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্মের মধ্যেও রসের অফুরান ভাণ্ডার আছে—বাংলার আদি রস-সাহিত্য বৈষ্ণব-সাহিত্য তাহার প্রমাণ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ এবং শাক্ত সাধকগণ ধর্ম্ম

এবং রসের যে যুক্তবেণী রচনা করিয়াছেন, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বাঙালীর ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্ট হইয়াছে—তাহার গোপন মনে রসের দেউল গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত বাঙালীর জীবন ও সাহিত্য দেবতার নাটমন্দিরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ।

ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে একটা আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মুসলমানদের রাজত্বকালে—তাহারা দিয়াছিল বাহিরের ধর্ম্মের মন্দিরে হানা। তাই হিন্দুর ধর্ম্মমন্দিরের চূড়া ভাঙিলেও হিন্দুর মর্ম্মলোকের রসের দেউলের কোন হানি তাহারা করিতে পারে নাই। এবং বাহিরে মন্দিরচূড়া যতটুকু ভাঙিয়াছে ভিতরের রসের দেউলে তাহার অপেক্ষা বহুগুণে উচ্চ মণিময় চূড়া বাঙালী হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবন এবং অপর ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অপর দিকে হিন্দু বিজয়ী রাজা মুসলমান জাতিকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করিয়া তাহাদের উপর যে বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছে জগতে তাহার তুলনীয় দৃষ্টান্ত বিরল। ফলে হিন্দুর সংস্কৃতিও মুসলমানের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পরস্পরের অন্তর্লোকের দ্বার পরস্পরের কাছে অবরুদ্ধই রহিয়া গেল, উভয় পক্ষের কেহ সেখানে করাঘাত করা পর্য্যন্ত প্রয়োজন বোধ করিল না। দুইটি বিশিষ্ট জাতির সম্মেলনের এক অভিনব সার্ব্বজনীন রসলোকের সৃষ্টি হয় নাই। আপন আপন সম্প্রদায়গত দেবতা জীবন-দেবতা হইয়া রসলোকে রাজত্ব করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ আসিয়া হানা দিল মর্ম্মলোকে। পরাধীনতার শিকলের সঙ্গে তাহারা আর একটা বস্তু আনিয়াছিল—তাহাদের অভিনব সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির প্রধান ও প্রথম বাণী—স্বাধীনতার বাণী, বন্ধনকে অস্বীকার করার আবেগ। যে

বাণীব প্রেরণায়, যে আবেগের বেগে বাঙালীর সাহিত্যের চাবিপাশেব ধর্ম্মের নাটমন্দিবেব গণ্ডি-প্রাচীর ভাঙিয়াছে, সেই বাণীতেই, সেই বেগেই আজ এই বিচিত্র জাতীয আন্দোলন বৈদেশিক শাসনতন্ত্রকে অস্বীকাব কবিযা আপনাব অধিকাব দাবি কবিয়াছে। বাংলাব সাহিত্যে প্রথম 'বন্দে মাতবম্' ধ্বনিত হইযাছে, তাবপব সূচনা হইযাছে জাতীয আন্দোলনের।

এই নব ভাবধাবা সঞ্চাবেব যে বেগ সেই বেগে বাঙালী হিন্দুব অন্তর্লোকে প্রলযঙ্কব ভূমিকম্পেব মত একটা কম্পন সঞ্চারিত হইল—সে কম্পনে বসেব দেউলেব চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গণ্ডি-প্রাচীব ভাঙিযা মুক্ত প্রকৃতিব মধ্যে অসীম অনন্তকে অঙ্গনস্বরূপে পাইয়া সে দেউল অভিনব মহিমায মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। বাঙালী, দেবলোকেব প্রস্তব-প্রতীককে সে দেউল হইতে অপসাবিত কবিযা, সেখানে প্রতিষ্ঠা কবিল মর্ত্ত্যলোকেব মৃত্তিকা-জননীব মূর্ত্তি, মাটি হইল—মা। ঋষি বঙ্কিম সে দেবীব পূজাব মন্ত্র সৃষ্টি কবিলেন—'বন্দে মাতবম্'।

বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রথম সৃষ্টি 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'কপালকুণ্ডলা'য উপরোক্ত ওই দুই পবিবর্ত্তনই রূপ-পবিগ্রহ কবিল। ধর্ম্মকে অতিক্রম করিযা অভিনব বিষযবস্তু অবলম্বন এইখানে প্রত্যক্ষ—কিন্তু মাতৃপূজাব প্রেবণা তেমন প্রত্যক্ষ নয। তাহাব কাবণ বোধ হয পাশ্চাত্য বোমান্সেব প্রাণোন্মাদিনী মোহ, যাহাব ফলে তিলোত্তমা ও আয়েষাব মত নাযিকার সৃষ্টি, যে প্রেবণায তিনি 'কপালকুণ্ডলাব' মত একখানি নিটোল অশ্রুব মুক্তাব মালা বঙ্গভাষাব কণ্ঠহাবরূপে দোলাইযা দিলেন। কাব্যাংশ প্রবল হইলেও 'কপালকুণ্ডলা'ব সমপর্য্যাযেব সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের অধিক নহে। 'কপালকুণ্ডলা'র পব 'মৃণালিনী'। এই 'মৃণালিনী'তেই বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃদেবতাব প্রত্যক্ষ পূজকরূপে স্কন্ধে

গৈরিক উত্তরীয় ফেলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেশের জন্য নায়ক হেমচন্দ্রের স্বার্থত্যাগ—আত্মোৎসর্গের প্রবল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নবযুগের মহিমান্বিত ঋষির ধ্যানযোগের রূপ সুস্পষ্ট, দেশমাতৃকার পূজায়োজনের এইখানেই সূত্রপাত। সে আয়োজনের পূজা সার্থক হইল 'আনন্দমঠে'। 'মৃণালিনী'তে যেন সাধকের সম্মুখে মাতৃপূজার যোগের পন্থা, নিয়ম, মন্ত্র স্পষ্ট নয়, তাই দেশানুরাগের উচ্ছ্বাস কিছু প্রবল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু 'আনন্দমঠে' ঋষি সিদ্ধ হইয়াছেন—কঠোর সাধনায় পূজার পন্থা, নিয়ম, মন্ত্র বাল্মীকিকণ্ঠোচ্চারিত প্রথম কবিতার মত আপনি স্ফূর্ত্ত ও মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'আনন্দমঠে'র দেশপূজার পদ্ধতি পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুকরণ নয়—ভারতের সংস্কৃতি-সম্মত নিষ্কাম স্বদেশপ্রেম। আত্মসংযম ইহার যোগ, সন্ন্যাস ইহার পথ। দেশজননীকে সাধক যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন—তাই 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের মত মন্ত্র তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্"

—দেবীর সে এক মূর্ত্তি, সে তাঁহার বাহ্যরূপ। তাহার পরই দেবীর রূপের পরিবর্ত্তন হইতেছে—তাঁহার চোখের সম্মুখে মা যেন দশমহা-বিদ্যার মত রূপের পর রূপান্তর পরিগ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার সকল রূপের পরিচয় দিয়া চলিয়াছেন।—

"সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

—এ মায়ের অন্যরূপ। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা-রূপিণী জননী স্নিগ্ধ শান্ত হাস্যময়ী দেবতা—কিন্তু সপ্ত কোটী সন্তানের

করধৃত দ্বিসপ্ত কোটী কৃপাণের অগ্রবর্ত্তিনী জননী সাক্ষাৎ শক্তিরূপা—তাঁহার কণ্ঠে যেন আমরা ধ্বনিত শুনিতে পাই—'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং ॥' তারপর তিনি কখনও কাঞ্চনবর্ণা কমলা—কক্ষে তাঁহার মণিময় ঝাঁপি, হস্তে ধান্যশীর্ষ, কখনও তিনি তুষারশুভ্রবর্ণা বাণী—কোলে বীণা, হস্তে লেখনী, ললাটের তৃতীয় নয়ন হইতে বিচ্ছুরিত অজ্ঞানতমসানাশী জ্ঞানের আলো। বাহুতে তিনি শক্তি—হৃদয়ে ভক্তিরূপিণী—তিনিই প্রাণরূপা।

যাক, এই অমর মন্ত্র-সঙ্গীতের বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায়। 'আনন্দমঠে'ই মহাসাধক ঋষি বঙ্কিমের পূজা শেষ হয় নাই। 'দেবী চৌধুরাণী'তে নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ চিত্রিত করিতে গিয়াও তিনি দেশমাতৃকাকে ভুলিতে পারেন নাই। মাতৃপূজার আয়োজন এখানেও প্রত্যক্ষ। তারপর 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম'—সবগুলির মধ্যেই জীবন-দেবতা জন্মভূমি। বারবার তিনি রসস্রষ্টা হিসাবে, সাধক হিসাবে, গুপ্তমন্ত্রে লোকলোচনের অন্তরালে এ পূজা শেষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মা যেন আপনি দেখা দিয়াছেন—দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মহিয়সী ঝান্সির রাণীকে লইয়া একখানি বই লিখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গে'র মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। তিনি শ্রীশবাবুকে বলিয়াছিলেন, "ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল, ঝান্সীর রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে এমন নায়িকা আর নাই। ইংরেজ সেনাপতি রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক-পুরুষ।' আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক 'আনন্দমঠে'ই সাহেবেরা চটিয়াছে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে

না ।” (‘বঙ্কিম-প্রসঙ্গ’—পৃ. ১৯৭)। এখানেও এই প্রেরণার মূলে ছিল—মাতৃপূজার প্রেরণা। বাঙালীর দুর্ভাগ্য, নতুবা ‘ঝান্সির বাণী’ রচিত হইলে মাতৃপূজার আর এক অভিনব মন্ত্র—অভিনব পন্থা—বাঙালী আজ চোখের সম্মুখে পাইত।

কমলাকান্তের ‘একটি গীত’ প্রবন্ধেও সেই মায়েরই সন্ধান। সজল নয়নে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে তিনি সন্ধান করিতেছেন,—“যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন ?” কমলাকান্তের ‘আমার দুর্গোৎসবে’ শারদীয়া সপ্তমীতে সেই দেবী জলে হাসিয়াছে, ভাসিয়াছে—আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে। পূজামন্দিরের বেদিকার উপর বঙ্কিম তন্ত্রোক্ত দশভুজার পরিবর্তে সেই জন্মভূমিকেই দশভুজারূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এ প্রেম—এ নিষ্ঠার তুলনা হয় না। সাধক ভিন্ন সে দৃষ্টি কাহারও নাই—সে দৃষ্টিতে মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী জননী জন্মভূমি মুহূর্তে “দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী” আদ্যাশক্তি হইয়া উঠেন। সাধক ভিন্ন অপর কাহারও বলিবার শক্তি নাই—“এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববল-ধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি! এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তান একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্ত-শক্তিপ্রদায়িনি! এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব।”

বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার পূজার যে ধারা বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্তন করিয়া

গিয়াছেন—সাহিত্যে সে ধারা লুপ্ত না হইলেও সে খরবেগ তাহাতে আর নাই, স্রোতের চেয়ে সে ধারায় উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যই অধিক। বঙ্কিমচন্দ্র ভগীরথের মত যে মন্দাকিনীধারা বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করিয়াছিলেন—সে ধারার বেগ ও গভীরতা মজিয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে।

আজ অবশ্য বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ বলিবেন, ও ধারা বন্ধ হইবার যে দিন আসিয়াছে। পাষাণী পূজার দিন এ নয়, মৃণ্ময়ী পূজার তিথিরও অবসান হইল। সম্মুখে গণদেবতার পূজার পর্ব্ব। পাষাণী ও মৃণ্ময়ীর পরিবর্ত্তে পূজাবেদিকায় জীবন্ত গণদেবতা সমারূঢ়। কিন্তু তবু মন মানে না, স্বীকার করিতে চায় না। প্রত্যক্ষ চোখে যে দেখিতেছি—বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে স্বদেশসেবক কর্ম্মীর সেবায় সাধনায় জননীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু সাহিত্যাঙ্গনের দিকে তাঁহার যে নয়নটি নিবদ্ধ ছিল, সে নয়ন আজ ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। তবুও আশা হয়—ভক্তই তো শুধু দেবতার তপস্যা করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া তোলে না, দেবতাও যুগে যুগে ভক্তের জন্য তপস্যা করেন—যে আসিয়া তাঁহাকে জাগাইবে—হাসাইবে—গাহিবে—

"যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি—
একবার তেমনি করে নাচ দেখি মা।"

আর মা নাচিবেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

যুগে যুগে কত কবি, কত কর্ম্মী, কত প্রেমী, জ্ঞানী
সঞ্চিত করিয়া রাখে ভারতের মহামনীষারে,
নবযুগচিন্তালোকে নবরূপে নিলে বরি' তারে
আপনার তপস্যায় চিরন্তন প্রাণের সন্ধানী।
হে ব্রাহ্মণ, তাই ঋজু বলিষ্ঠ কল্পনা দিলে আনি
শক্তিহীন মন্ত্রহারা জীবনের অযুত ধিক্কারে,
কুলিশ-কঠিন ছিল কুসুম-কোমল একাধারে
কভু হাস্যে, কভু ক্লেশে সর্ব্বরস-ঋদ্ধ তব বাণী।

ধিক্কারি' নারীর রূপ তবু নিত্য গড় তার স্তব,
রুদ্রবহ্নি দিয়ে রচি' অতনুর তনুর উল্লাস,
মরণ-সাগর মাঝে জীবনের ফেনিল উচ্ছ্বাস,
বিষনীল নভোতলে ধরিত্রীর যৌবন-উৎসব,—
সজল সহাস মুগ্ধ তাহে তব সর্ব্বলোক-দিঠি,
হে সবিতৃমণ্ডলের মধ্যাসীন কনক-কিরীটী।

শ্রীসুশীলকুমার দে

"যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা

১। গ্রন্থাবলী

১৮৯৪ সনের ৮ এপ্রিল তারিখে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই ৪৫ বৎসরের মধ্যেই তাহার পুস্তকগুলির বিভিন্ন সংস্করণ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল পুস্তক আবার ঠিক কোন সালে—বিশেষতঃ কোন ইংরেজী বৎসরে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাও নির্দ্ধারণ করা সকল ক্ষেত্রে সহজ নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একখানি ‘বঙ্কিম-জীবনী’ আছে এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (আষাঢ় ১৩৩৮) তাহার ৩য় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে, এই জীবনীতে প্রকাশকাল-সমেত বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকাবলীর একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের সকল পুস্তকের নাম ও কোন কোন পুস্তকের সঠিক প্রকাশকাল ইহাতে পাওয়া যায় না।

আরও একখানি পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্তের *A Critical Study of the Life and Novels of Bankimchandra*—অল্প দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের সকল পুস্তকের নাম নাই। প্রভূত অনুসন্ধানের ফলে আমি নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রস্তুত করিয়াছি।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১৮৫৬	**ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।**	পৃ. ৪১

পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকেব নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র বঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল।"

১৮৬৫ **দুর্গেশনন্দিনী**। ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। পৃ. ৩০৭

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জে. এফ. ব্রাউন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় কলিকাতা, থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক ইহা সম্পূর্ণ রোমান অক্ষবেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

[১৮৬৬] **কপালকুণ্ডলা**। পৃ. ১২৪

সংবৎ ১৯২৩

৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' '**কপালকুণ্ডলা**'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

[১৮৬৯] **মৃণালিনী**। পৃ. ২৪১

সংবৎ ১৯২৬

'1871' খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ইংরেজী আখ্যা-পত্র সম্বলিত ২৪১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একটি সংস্করণ আমরা পাইয়াছি, তাহার বাংলা আখ্যা-পত্রে কিন্তু 'সংবৎ ১৯২৬' ছাপা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১ম সংস্করণের পুনর্মুদ্রিত বাংলা আখ্যা-পত্র সম্বলিত এইটিই ২য় সংস্করণ।

[১৮৭৩] **বিষবৃক্ষ**। পৃ. ২১৩

১২৮০ সাল

১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

[১৮৭৩] **ইন্দিরা**। উপন্যাস। বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। পৃ. ৪৫
১২৮০ সাল

১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদশনে' প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের পুস্তকে (১৮৯৩, পৃ. ১৭৭) 'ইন্দিবা' "পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত" হয়।

[১৮৭৪] **যুগলাঙ্গুরীয়**। পৃ. ৩৬
১২৮১ সাল

১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৭৪ সনের মাঝামাঝি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ৯ আগষ্ট ১৮৭৪ তারিখের 'সাধারণী'তে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন-কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলির তালিকা-মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহার মূল্য ছিল ৵১০।

১৮৭৪ **লোকরহস্য**। (১২৭৯।৮০ সালেব বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত

'লোকরহস্য ১ম সংস্কবণ আমি এখনও কোথাও দেখি নাই। ১২৮১ সালের ফাল্গুন স খ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পুস্তকের প্রকাশকাল —১৮৭৪ সন দেওয়া আছে।

১৮৮৮ সনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ ১৭৪) প্রকাশিত হয়। "দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "লোকরহস্যেব দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেক পুরাতন ও অর্দ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন, এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নূতন করিযা

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল | পুস্তকের নাম | পৃষ্ঠা-সংখ্যা

লিখিত হইয়াছে। সকল গুলিই **বঙ্গদর্শন** ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

১৮৭৫ **বিজ্ঞানরহস্য** অর্থাৎ ১২৭৯।৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ। পৃ. ১৭০

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১২৯১ সাল, পৃ ৭৯) "সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা" প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভ্রমর'এ প্রকাশিত "চন্দ্রলোক" প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

[১৮৭৫] **চন্দ্রশেখর**। উপন্যাস। পৃ ১৯৫
১২৮২ সাল

১২৮০-৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

[১৮৭৫] **রাধারাণী।**

১২৮২ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের পুস্তক আমি এখনও কোথাও দেখি নাই। ১৮৯৩ সনে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৬৫) পরিবর্দ্ধিত।

১৮৭৫ **কমলাকান্তের দপ্তর।** (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) পৃ ১৬২

১২৮০-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সনে, পুস্তকের আখ্যা-পত্রে এই তারিখই দেওয়া আছে। ১২৯২

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

সালে (১৮৮৫ ?) 'কমলাকান্ত' নামে (পৃ ২৫) ইহার পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই গ্রন্থ কেবল 'কমলাকান্তের দপ্তরের' পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।..."চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত, এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।...কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। "বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও "কমলাকান্তের পত্র' মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।"

'কমলাকান্ত' পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে (১৮৯১ সন ?) ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "ঢেঁকি" নামক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। এই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই।

১৮৭৬ **বিবিধ সমালোচন**। (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) পৃ. ১৪৪

গ্রন্থকার পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।"

[১৮৭৭] ১২৮৪ সাল **রজনী**। উপন্যাস। পৃ. ১২২

১২৮১-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে, অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি "কাণা ফুলওয়ালী" আছে, রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়।"

১৮৭৭ **উপকথা**। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ। পৃ. ৮৩

ইহাতে 'ইন্দিরা,' 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' একত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৮১ সনে ইহা দ্বিতীয় বার (পৃ ৫৬) মুদ্রিত হয়।

১৮৭৮ **কবিতাপুস্তক**। পৃ. ১১২

'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমরে' প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা 'ললিতা' ও 'মানস' এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

১৮৯১ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃ. ১৪৪) এই পুস্তকের নামকরণ হয় 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'। দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—"এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল। "দুর্গোৎসব" 'বঙ্গদর্শন' হইতে, এবং "রাজার উপর রাজা" প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। 'কবিতা পুস্তক' অপেক্ষা 'গদ্য পদ্য' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্ত্তন করা গেল।"

১৮৭৮ **কৃষ্ণকান্তের উইল।** পৃ. ১৭০

১২৮২ ও ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

[১৮৭৯] **প্রবন্ধ-পুস্তক।** পৃ. ১৫৮

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে কোন তারিখ নাই। এই প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল. কেবল রাম শর্ম্মার প্রণীত "বুড়া বয়সের কথা" 'কমলাকান্ত' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৮৭৯ **সাম্য।** পৃ. ৬৮

"এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ [১২৮০ ও ১২৮২ সালের] বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে [১২৭৯ সালে] প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত।"

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

[১৮৮২]
১২৮৮ সাল

রাজসিংহ। ক্ষুদ্র ক — পৃ ৮৩

১২৮৪-৮৫ সালের 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত। ১৮৯৩ সনে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ ৪৩৪) বর্তমান আকারে "পুনঃপ্রণীত"।

[১৮৮২]
১২৮৯ সাল

আনন্দ মঠ। — পৃ ১৯১

১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

[১৮৮৪]
১২৯০ সাল

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। — পৃ ৪৭

(১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত)

[১৮৮৭]
১২৯১ সাল

দেবী চৌধুরাণী। — পৃ ২০৬

১২৮৯-৯০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত।

১৮৮৬

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস।

ইহাতে 'ইন্দিরা' (৪র্থ সং), 'যুগলাঙ্গুরীয় (৪র্থ সং), 'রাধারাণী' (৩য় সং) এবং 'রাজসিংহ' (২য় সং) একত্রে স্থান পাইয়াছে।

১৮৮৬

কৃষ্ণ চরিত্র। প্রথম ভাগ। — পৃ. ১৯৮

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—"কৃষ্ণচরিত্র…'প্রচার' নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল…

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল | পুস্তকের নাম | পৃষ্ঠা-সংখ্যা

প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু…আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।…আগে অনুশীলন ধর্ম্ম পুনর্মুদ্রিত করিয়া তৎপরে কৃষ্ণ চরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্ম ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।'

১৮৯২ সনে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ —"কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশ ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।

[১৮৮৭] ১২৯৩ সাল | **সীতারাম।** | পৃ. ৪১৯

প্রথম তিন বৎসর 'প্রচারে' (১২৯১-৯৪) প্রকাশিত।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
[১৮৮৭] ১২৯৪ সাল	**বিবিধ প্রবন্ধ**। প্রথম ভাগ।	পৃ. ২৮০

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'—"দুই খানি পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

[১৮৮৮] ১২৯৫ সাল	**ধর্ম্মতত্ত্ব**। প্রথম ভাগ। **অনুশীলন**।	পৃ. ৩৫৯

পুস্তকের "ভূমিকা'য় প্রকাশ, "এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে (১২৯১-৯৪) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

১৮৯২	**বিবিধ প্রবন্ধ**। দ্বিতীয় ভাগ। (বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত)	পৃ. ৩৫৬

সহজ রচনাশিক্ষা।

১৮৯৪ সনের ডিসেম্বর মাসে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।* ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক (পৃ. ৩২) আমি দেখিয়াছি।

* "বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্য-পুস্তক"—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত।—'মানসী ও মর্ম্মবাণী,' কার্ত্তিক ১৩৩২, পৃ ২৮০-৮২।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

..

সহজ ইংরেজী শিক্ষা

ইহার ৩য় সংস্করণ ১৮৯৪ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।* এই পুস্তক আমি এখনও দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-শেষে সন্নিবিষ্ট পুস্তকতালিকায় এই পুস্তকেব নাম আছে। মূল্য ।/০ ছিল।

১৯০২ **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।** পৃ. ৩৭৮+৯

দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় "সংগ্রহকাবের নিবেদন"-স্বরূপ লিখিয়াছেন :—"...'প্রচারে' [২য়-৩য় বর্ষেব ১২৯৩-৯৫] এই গীতাব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।... প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।...তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] যেটুকু লিখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সেইটুকু মুদ্রিত করিলেই চলিত। কিন্তু গীতাব ন্যায় একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ হিন্দুমাত্রেই স্বীয় গৃহে সম্পূর্ণ বক্ষা কবিতে ইচ্ছা কবেন এবং বাখাব প্রয়োজনও আছে। এজন্য অবশিষ্ট মূলও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়েব কৃত অনুবাদসহ ইহাতে নিবেশিত হইল। বর্ত্তমান গ্রন্থেব লেখক মহোদয কর্ত্তৃক গীতাব চতুর্থ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র।"

১৯৩৫ **Rajmohan's Wife** পৃ. ১৫৬

১৮৬৪ সনের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে এই ইংরেজী উপন্যাসখানি ধাবাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয। ১৯৩৫ সনে

* "বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্য-পুস্তক"—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত।—'মানসী ও মর্ম্মবাণী,' কার্ত্তিক ১৩৩২, পৃ. ২৮০-৮২।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে আমি ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরেজী উপন্যাসখানির প্রথম কয়েক অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম সাত অধ্যায় *Rajmohan's Wife* পুস্তকের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ।

২। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত অথবা তল্লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত গ্রন্থ*

[১৮৭৭]
১২৮৩ সাল

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী

(দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী)

[১৮৮৫]
১২৯২ সাল

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ

(কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত)

১৮৯২

Bengali Selections

Appointed by the Syndicate of the Calcutta University For the Entrance Examination 1895 Compiled by Bankim Chandra Chatterjee

* বঙ্কিম-লিখিত ভূমিকার নামগুলি স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত হইল।

আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল	পুস্তকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১৮৯২	**বাঙ্গলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান** (লুপ্ত রত্নোদ্ধার—টেকচাঁদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী)	
১৮৯৩	**৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী** (সঞ্জীবনী সুধা অর্থাৎ ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থ সকলের উৎকৃষ্টাংশ সংগ্রহ। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত)	

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি বাংলা রচনা

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি রচনার কথা জানা গিয়াছে। সেগুলির উল্লেখ করিতেছি :—

(ক) **নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী**—'বঙ্কিম জীবনী', পৃ. ৩১৬-৪৮। ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে'র পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।

(খ) **ভিক্ষা**—'বঙ্কিম-জীবনী', পৃ. ৩৬৫-৬৮

(গ) **বঙ্গে দেবপূজা**—এই নামে একটি প্রবন্ধ ১২৮১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের 'ভ্রমরে' "শ্রী"-স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম প্রবন্ধে "বং"-স্বাক্ষরে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার একটি ৭ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। "বং" যে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রমাণ—এই স্বাক্ষরে 'ভ্রমরে'র চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "চন্দ্রলোক" প্রবন্ধ দ্বিতীয় সংস্করণ 'বিজ্ঞানরহস্যে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(ঘ) **বিরহিণীর দশ দশা**—এই কবিতাটি ১২৭৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' হইতে ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'পঞ্চপুষ্পে' 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিরহিণীর দশ দশা' নামে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। 'পঞ্চপুষ্পে'

প্রকাশিত এই রচনাটির লেখক সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এ-কথা জ্যোতিশ্চন্দ্র ১৯৩০-৩১ সনে লিখিত ডায়েরীর ১৩ পৃষ্ঠায় স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমের সমসাময়িক লেখক ছিলেন।

(ঙ) **কাকাতুয়া**—এই নামে ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ "শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত" হইয়া ১২৮৯ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি 'কমলাকান্ত' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ইহা বঙ্কিমের রচনা বলিয়াই মনে হয়।

(চ) **জাতিবৈর**—১১ কার্ত্তিক ১২৮০ তারিখের 'সাধারণী' হইতে 'ছোট গল্প' ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

(ছ) **দুর্গাপূজা**—১২৮১ সালের 'ভ্রমর' হইতে 'ছোট গল্প' ২য় বর্ষ শারদীয়া সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

শেষোক্ত রচনা দুইটি যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই, সংগ্রহকর্ত্তার তাহা অনুমান মাত্র—কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ তিনি দেন নাই।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা—গদ্য ও পদ্য—প্রধানতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হইয়াছিল। 'প্রভাকরে'র যে-সকল পুরাতন সংখ্যা দেখিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনার একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। এই সকল রচনার মাত্র চারিটি পদ্য ও একটি গদ্য 'বঙ্কিম-জীবনী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে, বাকীগুলি আমি ১৩৩৮ সালের কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিয়াছি। এখানে বলা প্রয়োজন, অনেক সময় বঙ্কিমচন্দ্র "শ্রীব, চ. চ" স্বাক্ষরে কবিতা লিখিতেন। কয়েকটি কবিতা

"শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়, হুগলি কালেজের ছাত্র", এবং কয়েকটি "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, হুগলি কালেজের ছাত্র" স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে, এগুলিও তাঁহার রচনা বলিয়া আমার বিশ্বাস।

পদ্য :—

'সংবাদ প্রভাকর'

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ — স্ত্রীর উক্তি ও পতির উত্তর।—শ্রীব, চ, চ।

২৬ মার্চ " — বসন্ত।—শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়। হুগলি কালেজের ছাত্র।

২৮ মে " — জীবন ও সৌন্দর্য্য অনিত্য।—শ্রীব, চ, চ। হুগলি কালেজ।

২৮ জুন " — রূপক। শ্রীরাধিকা নিশাবসানে স্বীয় সখীগণে সম্বোধন পুরঃসর সকল দিগ্‌দর্শন করিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকটন করিতেছেন।—শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়। হুগলি কালেজ। সাং গৌরীভা।

১০ জানুয়ারি ১৮৫৩ — হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন।

৫ ফেব্রুয়ারি " — শিশির বর্ণনা ছলে স্ত্রী পতির কথোপকথন। ('বঙ্কিম-জীবনী', পৃ. ৪৩ ৪৭)

১৭ ফেব্রুয়ারি " — দূরদেশ গমনের বিদায়। ('বঙ্কিম-জীবনী', পৃ. ৫৪-৫৯)

১৮ মার্চ " — কামিনীর প্রতি উক্তি।

৩০ মার্চ " — চন্দ্রদূত। ('বঙ্কিম-জীবনী', পৃ. ৫৯-৬৫)

১৩ এপ্রিল " — স্বপ্ন। রূপক। [গদ্যে-পদ্যে লিখিত]—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হুগলি কালেজের ছাত্র। সাং গৌরীভা।

২৭ এপ্রিল " — বসন্তের নিকট বিদায়।

২৭ মে " — বিচিত্র নাটক। (কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ)

১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫২ বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতির রসালাপ।
('বঙ্কিম-জীবনী,' পৃ ৪৮ ৫৪)

২৭ সেপ্টেম্বর ,, কালেজীয় কবিতার মারামারি
বিষম "বিচিত্র নাটক"।

[১৩০১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্যে' "বর্ষার মনোরঞ্জন" নামে বাল্যকালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা 'বঙ্কিম-জীবনী'তেও (পৃ. ৩৪৯-৫১) উদ্ধৃত হইয়াছে।

গদ্য :—

১০ মার্চ ১৮৫২ দর্পণ।—৯৯ সংখ্যক 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশিত
কবিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র।

২৩ এপ্রিল ,, [illegible]।—শ্রীব. চ. চ.। হুগলী কালেজ।
('বঙ্কিম-জীবনী,' পৃ. ৬০-৬১, 'মানসী' ও
মর্ম্মবাণী, কার্ত্তিক ১৩৩১ দ্রষ্টব্য)

১০ জুলাই [illegible]। ('মানসী ও মর্ম্মবাণী,' কার্ত্তিক ১৩৩১)

ইংরেজী রচনা

প্রকাশিত :—

সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের যে-কয়টি ইংরেজী রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল। এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

১। "On the Origin of Hindu Festivals"—Transactions of the Bengal Social Science Association for 1869. Vol III.

২। "A Popular Literature for Bengal"—Transactions of the Bengal Social Science Association for 1870. Vol. IV

৩। "Bengali Literature"—*The Calcutta Review*, 1871, No 104, pp. 294-316.

৪। "Buddhism and the Sankhya Philosophy"—*The Calcutta Review*, 1871, No 106, pp. 191-203.

৫। "The Confessions of a Young Bengal"—*Mookerjee's Magazine*, December 1872, pp. 337-42.

৬। "The Study of Hindu Philosophy" : B. C. C.—*Mookerjee's Magazine*, May 1873, pp. 160-69.

৭। ১৮৮২ সনের 'স্টেট্‌সম্যান্‌' পত্রিকায় হেষ্টি (Hastie) সাহেবের সহিত বাদ-প্রতিবাদে ছদ্মনাম—"রামচন্দ্র"-স্বাক্ষরিত তিনখানি পত্র, এবং এই প্রসঙ্গে পাদরি কৃষ্ণমোহনের প্রতিবাদস্বরূপ ১৪ নবেম্বর ১৮৮২ তারিখযুক্ত বঙ্কিমের পত্র। এগুলির অংশবিশেষ শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৮। "Vedic Literature"—*The Calcutta University Magazine*, March and April, 1894.

এই পত্রিকাখানি Society for the Higher Training (পরে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট) প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র ছিল। ১ম বর্ষের পত্রিকায় (১৮৯৪ সনে) বঙ্কিমচন্দ্রের দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ বার্ষিক বিবরণে (১৮৯৪) প্রকাশ—"On Friday, the 9th February the President of the Literary Section, Rai Bunkim Chunder Chatterjea Bahadur, delivered the first of a series of lectures on Vedic Literature, a second lecture was delivered in March ; but the series was cut short by the sad death of this gifted author."

৯। ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত হাণ্টার (W. W. Hunter) সাহেবের *A Statistical Account of Bengal* (Vol. IX) পুস্তকের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কিছু উপকরণ জোগাইয়াছিলেন। এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় প্রকাশ—

> 1. This Account of Murshidabad District has been compiled chiefly from the following sources:—The answers to my five series of questions, signed by ..Babu Bankim Chandra Chattarji, Deputy Collector, dated 1870-71;...(5) Report on the Land Tenures of the District, by Babu Bankim Chandra Chattarji, Deputy Collector, dated October 1873 ,. .

হাণ্টার সাহেব নিম্নলিখিত ভূমিকা করিয়া, তাঁহার পুস্তকের ১১৫-২৩ পৃষ্ঠায় শেষোক্ত রিপোর্টটি মুদ্রিত করিয়াছেন :—

> LAND TENURES.—The following account of the land tenures in Murshidabad is mainly derived from a report drawn up by Babu Bankim Chandra Chattarji, Deputy Collector, and dated October 18, 1873.

['বঙ্কিম-জীবনী'তে প্রকাশ (পৃ ১০৮), বাংলা উপন্যাসে হাত দিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র "Adventures of a Young Hindu" রচনা করিয়াছিলেন। এই রচনাটির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই]

অপ্রকাশিত :—

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি রচনার পাণ্ডুলিপি অল্প দিন পূর্ব্বে পাইকপাড়া রাজবাটীতে বঙ্কিম-উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেগুলি এই—

(ক) ১৮৮২ সনের অব্যবহিত পরে, Letters on Hinduism নামে কয়েকখানি দীর্ঘ পত্রে (পজিটিভিষ্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখিত বলিয়া

মনে হইতেছে) বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এগুলি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ১৮৮৮ সনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পুস্তকের ৩৩৭-৩৯ পৃষ্ঠায় উক্ত অপ্রকাশিত প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :— "লেখকপ্রণীত কোন ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।"

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত 'দেবী চৌধুরাণী'র কয়েক অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ। সমগ্র অংশের অনুবাদ পাওয়া যায় নাই।

(গ) Caste in Lower Bengal নামে একটি ইংরেজী রচনার পাণ্ডু-লিপি। সম্ভবতঃ এই প্রবন্ধও বঙ্কিমচন্দ্র *Statistical Account*-জাতীয় কোন পুস্তকের জন্য লিখিয়াছিলেন। ইহার এক স্থলে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, ১৮৭২ সনে প্রকাশিত বেভারলি সাহেবের সেন্সাস্ রিপোর্টের উপরেও কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত অংশটি এইরূপ :—

> "Such identification is possible in a large number of cases. The first illustration which I shall offer of such possibility will be the case of the Pundras, referred to by Mr. Beverley, in the last para of Section 455 of the Census Report of 1872, with regard to which my remarks seem to have been, to a certain extent, misunderstood."

[এই রচনাপঞ্জী সঙ্কলনকালে শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।]

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রোহিণী

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ইহা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন যে, প্রায় একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহার দুইটি উপন্যাসে, যেমন একদিকে সূর্য্যমুখী কুন্দ ও নগেন্দ্র, তেমনই অন্যদিকে ভ্রমর গোবিন্দলাল ও রোহিণী, পরস্পরের পুনরুক্তিমাত্র না হইয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। এখানে কেবল অবস্থাভেদের কথা নহে, অন্তর্গত ভাবের পার্থক্যে প্রত্যেক চরিত্র-চিত্রের মূল-কল্পনাটি বিভিন্ন আকারে পল্লবিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই বিষবৃক্ষের রোপণ, উদ্‌গম ও মূলোচ্ছেদ চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু পৃথ্বী-মৃত্তিকার এক প্রদেশে তাহা যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ হওয়া সকল সময়ে স্বাভাবিক নহে। কুন্দনন্দিনীর অবসান করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু রোহিণীর বিনাশ ঘৃণ্য ও ভয়াবহ। বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অন্য কোনও নায়িকার প্রতি এরূপ অপরিসীম নির্ম্মমতা দেখান নাই। শৈবলিনী ও রোহিণী এই উভয়কেই তিনি পাপীয়সী বলিয়াছেন, শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে কুৎসিত পরিণামের অতলে ডুবাইয়া রোহিণীর মত নিষ্ঠুরভাবে হত্যার হস্তে সমর্পণ করেন নাই।

কিন্তু রোহিণীর এই পরিণাম হইল কেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে কঠোর নীতিদর্শী বলিয়াছেন, কিন্তু রোহিণীর দুর্ভাগ্যকে কেবল পাপের শাস্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গত হইবে না। তাহা যদি হয়, তবে নিষ্পাপ ভ্রমরও কেন শাস্তি ভোগ করিয়াছে? বিভিন্ন প্রকারে উভয়েরই ভাগ্যে অবশেষে মৃত্যুদণ্ড আসিয়াছে। রোহিণীর পাপ স্বীকার করিয়া লইলেও, অনভিজ্ঞ বালিকার অভিমান ও অবিমৃশ্যকারিতা তাহার সহিত

কি সমান দণ্ডে দণ্ডিত হইবে? তাহা হইলে মূল প্রশ্ন হইতেছে, এই দুইটি জীবনের যে tragedy বা বিয়োগান্ত পরিণাম, তাহার জন্য দায়ী কে?

গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা সমর্থন করিয়া অনেকে বলিবেন যে, কৃষ্ণকান্তের উইলই সকল সর্ব্বনাশের মূল। একদিক দিয়া দেখিলে ইহা সত্য বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু জীবনের কোনও শোচনীয় পরিণতি কেবল বাহ্যিক ঘটনার অনির্দ্দিষ্ট নিয়তির উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে মানুষের ভাব, চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির কোন মূল্যই থাকে না। মানুষ অবস্থার দাস বটে, কিন্তু অবস্থার নিয়ন্ত্রণ তাহার শক্তির একেবারে বহির্ভূত নহে। কেবল ঘটনা-পরম্পরা নহে, অন্তর্গত ভাবনাও মানুষের জীবন-চক্রকে চালিত করে।

কৃষ্ণকান্তের উইলকে মুখ্যত দায়ী না করিলে বলিতে হইবে যে, ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলাল, ইহাদের মধ্যে একজন অথবা তিন জনই হয়তো সমানভাবে দায়ী। ইহা সত্য যে, তিন জনই বিভিন্ন প্রকারে বিষবৃক্ষের ফলভোগী, এবং আংশিকভাবে নিজের ও পরস্পরের শাস্তিকে সুগম করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে একের দোষ অন্যকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু সত্যই কি তিন জনে সমান ভাবে দায়ী?

বয়স ও সাংসারিক-জ্ঞান হিসাবে ভ্রমর নিতান্ত বালিকা, সুতরাং তাহার দুর্জ্জয় অভিমান ও চিন্তাহীনতার পরিণাম যে কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা সে তাহার সরলতায় প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে বুঝিয়াও বোঝে নাই। সে স্বামীকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত, কিন্তু স্বামীকে চিনিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাই, যখন তাহার অগাধ বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিতে আঘাত লাগিল, তখন সে আর কিছু বোঝে নাই, কেবল বুঝিয়াছিল যে, তাহার কপাল ভাঙিয়াছে। ইহার বেশি কিছু বুঝিবার

সময়, শক্তি বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। তাই ক্রোধে, দুঃখে, দম্ভে ও অভিমানে চিন্তাশূন্য হইয়া স্বামীকে লিখিল—"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমাবও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমাব উপব আমাব ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমাব দর্শনে আমাব আর সুখ নাই।" এমন কি, বোহিণীর মৃত্যুব পবও, গোবিন্দলাল যে পাপী ও হত্যাকাবী এ কথা ভ্রমব ভুলিতে পারে নাই, কোনও দিন বলিতে পাবে নাই—হোক সে পাপী, হোক সে হত্যাকাবী, তবুও সে আমাব স্বামী, সে আমাব আপনাব। ভালবাসা দিয়া, দবদ দিয়া কোনও দিন সে কোনও ক্ষত ঢাকিযা দিতে পারে নাই, কোনও অপরাধ অশ্রুজলে মুছিযা দিবাব চেষ্টা কবে নাই। গোবিন্দলাল নিজেও প্রথমে বিশ্বাস কবিতে পাবে নাই যে, ভ্রমব এরূপ চিঠি লিখিতে পাবে, সাবিত্রী যে শাড়ি ছাড়িয়া গাউন পবিবে, তাহা তাহাব কল্পনাবও অতীত। ভ্রমর যদি তাহাকে বোঝে নাই, সেও কোন দিন ভ্রমরকে বোঝে নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই। তাহাব মনে তখন অন্য চিন্তার বীজ পল্লব বিস্তাব কবিযাছিল, সুতরাং তাহাব বুঝিবাব ক্ষমতা ছিল না যে, ভ্রমবের এই মনেব অবস্থাব জন্য সে নিজে কত অপবাধী, বিশ্বাস-ভঙ্গের কত বড আঘাত তাহাব সবল নিশ্চিন্ত মনে লাগিযাছে। ভ্রমরেব আত্মঘাতী অভিমান হয়তো খুব বড একটি ভুল কবিযা বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার এই মনের অবস্থাব জন্য প্রথম হইতেই গোবিন্দলালই দায়ী। গোবিন্দলালেব প্রশ্রয়ে ও আদরে তাহার মনের বয়স কোনও দিন বাড়ে নাই। ভ্রমর তাহার খেলার পুতুল ছিল—এ কথা ভ্রমর নিজেও বলিযাছে, তাই সে হাসিতে পটু হইলেও কোনও দিন স্নেহের শাসনে পটু হয় নাই, গোবিন্দলালের অস্থির চিত্তকে আত্মবিস্মৃতা নারীর গভীর প্রেমে তৃপ্ত করিতে পাবে নাই। ভ্রমবের পিত্রালয়গমন ও সূর্য্যমুখীর

গৃহত্যাগ—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য রহিয়াছে। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথেব ভাব-বন্ধনের মত ভ্রমর ও গোবিন্দলালের ভালবাসা বহুদিনেব নিবিড়বন্ধ পবিচয়ে পরস্পরের ভাবজ্ঞ ছিল না; নিজের বা পবেব মর্য্যাদাশীল ও ক্ষমাপ্রবণ তো ছিলই না। ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালেব আকর্ষণ অসত্য ছিল না, কিন্তু বন্ধনের লঘুতায তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ হয নাই। ভ্রমবকে গোবিন্দলাল ক্ষমা করিল না, কিন্তু ভুলিতে পাবিল না, অন্য আকর্ষণ প্রবলতব হইযা ভাগীবথীজল-তরঙ্গে ক্ষুদ্র তৃণেব মত তাহাকে ভাসাইযা লইযা গেল। তাই নগেন্দ্রনাথেব মত গোবিন্দলাল কোনও দিন বলিতে পাবে নাই—"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূযামুখী আমাব সব। আমাব সূয্যমুখী—কাহাব এমন ছিল? সংসাবে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদযে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। আমার নয়নেব তাবা, হৃদযেব শোণিত, দেহেব জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব। আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ। আর এমন সংসাবে কি আছে?" আত্মসংযমেব অভাবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গোবিন্দলাল কেবল বলিযাছে—"আমি মবিব, ভ্রমব মবিবে।" এই নিশ্চিত ধ্বংসেব সম্মুখীন হইযা দুর্ব্বলচিত্তেব আত্মপ্রবঞ্চনা আছে, আত্মজযেব আড়ম্বব আছে, কিন্তু আন্তবিক চেষ্টা নাই, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক মনকে সান্ত্বনা দিল যে, ভ্রমবকে ভুলিবাব, ভ্রমবেব স্পর্দ্ধা ভাঙিবার প্রকৃষ্ট উপায়—রোহিণীব চিন্তা।

তাই, 'পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' গোবিন্দলাল আগুনে ঝাঁপ দিল, কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিবাব মত শক্তি ও দৃঢ়চিত্ততা তাহাব ছিল না; দুঃসাহস ছিল, কিন্তু তাহাব অনুরূপ বলিষ্ঠতা ছিল না। স্রোতের মুখে গা ঢালিযা দেওযা যেরূপ সহজ, তাহার বিরুদ্ধে অভিযান কবা সেইরূপ প্রযাসসাধ্য, গোবিন্দলালেব পক্ষে সহজ পথই স্বাভাবিক। সেইজন্য,

নগেন্দ্রনাথ বা ভবানন্দের যে নিষ্কপট মর্ম্মস্পর্শী আত্মসংগ্রাম দেখিতে পাই, গোবিন্দলালের তাহা নাই। রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাহার হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছিল, ভ্রমরের ভুল ও রোহিণীর আবির্ভাব তাহাকে যে সুযোগ দিয়াছিল, তাহা চরিতার্থ করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইল না। কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্ত্তন এই সুযোগের একটি উৎকৃষ্ট কৈফিয়ৎ হইয়া ব্যাপারটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। দ্বিধার আর অবকাশ রহিল না, "আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা" সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতার "ক্ষমা কর, আমি বালিকা" এই অসহায় ক্রন্দনের উত্তরে রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দলাল অনায়াসে বলিল—"আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।" সাবিত্রীর গাউন পরা সহিল না, গাউনের নীচে যে চিরাভ্যস্ত শাড়ি উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, শেষে তাহাই তাহার দেহের ও মনের স্বাভাবিক আবরণ হইল। আধুনিক সত্যবান ক্ষমা করিল না, সাবিত্রীও স্বামীকে বাঁচাইতে পারিল না, মৃত্যুকে জয় করিতে পারিল না, মৃত্যু জয়ী হইল। তথাপি মরণেও তাহার সাহসের অভাব ছিল না, স্বামীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া পদধূলি লইয়া অবশেষে বলিল—"আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল ধনীর সন্তান হইলেও উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, কিন্তু সে নিজের প্রবৃত্তির পথে কখনও কোন বাধার সম্মুখীন হয় নাই, আত্ম-সংযমের ইচ্ছা বা অভ্যাস তাহার ছিল না। তাই প্রথম জীবন-সঙ্কটে দারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেও নিজেকে সামলাইবার আন্তরিক প্রয়োজন সে অনুভব করে নাই, উপায়ও জানিত না। প্রথমে ভদ্রতা, সহৃদয়তা অথবা বংশোচিত মর্য্যাদা-জ্ঞানের অভাব ছিল না, তাই সে

মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, মরিতে হয় মরিবে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হইবে না। কিন্তু দুর্ব্বলচিত্তের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ-যৌবনের "উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল" মনোবৃত্তির প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং ভ্রমররূপ অন্তরায় ক্রমশ অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বারুণীর তীরে যখন জলমগ্না রোহিণীকে সে বাঁচাইল, তখন তাহার স্বভাব-কোমল ও প্রলোভন-উন্মুখ চিত্ত বিচলিত হইলেও সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয় নাই। তখন তাহার মনে হইয়াছিল—এই অপরূপ সুন্দরীর আত্মঘাতের মূল সে নিজেই, আত্মছলনার বশে এরূপ চিন্তার যে বেদনা, তাহাতেও সুখ আছে। সত্য হউক বা ছলনা হউক, দুঃখময় সুখের স্মৃতি কোমল ও দুর্ব্বল চিত্তের কাছে এত মধুর যে, তাহাকে জোর করিয়া তাড়াইলেও সে যায় না। কিন্তু এতটা হইত না, যদি ঘটনা-পরম্পরায় ভ্রমরের পিত্রালয় গমন ও কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্ত্তনের সুযোগ ও সুবিধা আপনা হইতে আসিয়া না জুটিত, এবং চঞ্চল প্রবৃত্তির পথ আরও সুগম করিয়া না দিত। যাহা স্মৃতিমাত্র ছিল, তাহা কাল্পনিক দুঃখে পরিণত হইল, এবং দুঃখ হইতে কামনা আপন নগ্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ভ্রমরের কাছে যে সে অপরাধী তাহা গোবিন্দলালের অজ্ঞাত ছিল না, তাই যাইবার পূর্ব্বে ভ্রমরের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহস হইল না, কিন্তু তখন আর তাহার ফিরিবার পথ ছিল না।

ভ্রমর তো মরিল, নিজের সর্ব্বনাশের তো কিছুই বাকি রহিল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল রোহিণীকেও ডুবাইল। যে আপনি ডুবিতে উন্মুখ ও অগ্রসর, তাহাকে অধঃপতনের সর্ব্বনিম্নস্তরে লইয়া যাইতে তাহার দ্বিধা বা বিলম্ব হইল না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে যে, রোহিণী প্রথম হইতেই কেবল কুৎসিত লালসার বশবর্ত্তী গোবিন্দলালের অনুগামী হইয়াছিল। তাহা যদি হয়, তবে উপন্যাসের প্রারম্ভে রোহিণীর বিবরণে

যে কাব্যাংশের অবতারণা, তাহার কোনই অর্থ হয় না। বারুণীর তীরে, কোকিলের কুহুরবের সঙ্গে, মধুমাসের মাদকতার পরিবেষ্টনীর মধ্যে পরিপূর্ণ-যৌবনা রোহিণীর যে রূপচ্ছবি, তাহা সেই বসন্তের কুসুমসম্ভার ও কোকিলের পঞ্চমে-বাঁধা কুহুরবের সহিত একই সুরে বাঁধা। এই অপরূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-কল্পনা যেরূপ চরম সীমায় গিয়াছে, তাহা তাঁহার উপন্যাসের অন্যত্র বিরল।

"রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর—স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল, সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল। এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল—"কু উ।" তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।"

যে সুন্দরীকে সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টা তাহার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ, এবং কুহুরবের পঞ্চমের সঙ্গে আপনার উচ্ছ্বসিত কল্পনাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাকে শেষে তিনিই পাপীয়সী রাক্ষসী বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু এই গালিই শেষ কথা নহে। রমণীরূপলাবণ্য গোবিন্দলালকে উদ্‌ভ্রান্ত

করিয়াছে, কিন্তু তাহার কবি-স্রষ্টাকেও আপনার অজ্ঞাতে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহাতেই এই গালির সার্থকতা। "অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র, দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, কিন্তু চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল।" কিন্তু শেষে যে কালিমালেপনের দ্বারা চিত্র ও চিত্রপট উভয়ই লুপ্ত হইল, তাহাতে মনে হয় যে, রোহিণীর চরিত্রে যে অপরূপ সম্ভাব্যতা ছিল, তাহা উপন্যাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ফুটিবার অবকাশ পায় নাই।

রোহিণী বৈধব্যের কোনই নিয়মশাসন মানিত না, তাহাকে শাসন করিবারও কেহ ছিল না। যৌবনের চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে নারীসুলভ ভাবভঙ্গি ও অশিক্ষিতপটুত্বের জন্য তাহার ব্যাপিকা-অপবাদ বিচিত্র নহে, কিন্তু হরলালের সহিত তাহার যে-ব্যবহার তাহা হইতে জানা যায় যে, একটি নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইলেও, অসৎপ্রবৃত্তি বা কুটিলতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অর্থের প্রলোভন তাহাকে লুব্ধ করে নাই, এমন কি, যখন সে হরলালের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, তখন আশাভগ্ন হইয়াও তাহাকে সম্মার্জ্জনী দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু গোবিন্দলালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ যে-পরিবেষ্টনীর মধ্যে হইয়াছিল, তাহাতে তাহার যৌবন-সুলভ কল্পনা তাহার মানসচক্ষে আঁকিয়া দিয়াছিল—"বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোকপ্রতিভাসিত, চম্পকদাম-বিনির্ম্মিত" এক অপূর্ব্ব দুর্লভ "দেবমূর্ত্তি"। এই চিত্র দিন দিন নানা অনুকূল ঘটনার মধ্যে তাহার হৃদয়পটে গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইয়া একাধারে তাহার সর্ব্বকামনার ও সর্ব্বদুঃখের মূল হইয়া দাঁড়াইতেছিল। কিন্তু যৌবন-স্বপ্নের নেশায় মশগুল হইয়া তখনও সে দেখে নাই—এই দেবমূর্ত্তি কি মৃত্তিকায় গঠিত। তখন সে ভাবিতেছে—"রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ

করিতে পারিব না, আশাও নাই। চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরাব অপেক্ষা একেবাবে মবা ভাল।" আশাহীন দুঃখে সে মৃত্যুকে ববণ কবাই শ্রেয়স্কব মনে কবিযাছিল, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের বত্নাবলীব মত, মবিতে গিযা সে বাঞ্ছিতেব বাহুপাশে সঞ্জীবিত হইয়া আবার নূতন মবণে মবিল। পাপ-পুণ্যেব কথা সে শেখে নাই, পাপ-পুণ্যেব কথা সে জানিত না—এ কথা সে নিজেই বলিয়াছে। যে-ভালবাসা তাহাব হৃদযে প্রথম বহ্নিজ্বালা বিস্তাব কবিযাছিল, তাহা তখনও পাপ-পুণ্যেব অতীত, কিন্তু তাহাব পাবক-পবশ তাহাকে পোড়াইল, মনেব কালিমা ঘুচাইল না। তাই নিদারুণ যন্ত্রণায় সে ডাকিল—"হে জগদীশ্বব, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনেব একমাত্র সহায়, আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িযাছি—আমায বক্ষা কব, আমাব হৃদযেব এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইযা দাও—আব আমায় পোড়াইও না।"

বন্ধনহারা কিন্তু বন্ধনলিপ্সু যুবতীব তৃষাতাড়িত হাহাকাব তাহাকে যে পথে লইয়া গেল, তাহা হইতে আব ফিবিবাব উপায তাহাব ছিল না। ভ্রমরেব চেযে রোহিণী গোবিন্দলালকে ভাল কবিযাই বুঝিযাছিল, এবং সে বোঝা তাহাব অনুকূলেই ছিল। তবুও সে জানিত যে, গোবিন্দলাল ভ্রমরকে সত্য সত্যই ভালবাসে, তাহাব নিজেব প্রতি যে আকর্ষণ তাহা ক্ষণিকের মোহ মাত্র। তাই ভ্রমরের সুখ তাহাব সহ্য হইল না, ঈর্ষার উত্তেজনায পুঁটলি হাতে লইয়া ভ্রমবকে দেখাইযা আসিল। আত্মসুখের কামনা তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন কবিল। সে ভাবিল—"কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড?" অসামান্য রূপ, উদ্দাম যৌবন,—সকলই কি ব্যর্থ হইবে? তাহারও কি সুখের অধিকার নাই? যে-সুখ তাহার রূপ ও যৌবনের প্রাপ্য, তাহা সে সহজে ছাড়িবে কেন? এদিকে, অনুকূল পবনে

চালিত, তরঙ্গভঙ্গে বিভিন্ন হইয়াও গোবিন্দলালের তরণী তাহারই কূলে আসিয়া ভিড়িল। ধৈর্য্যহীন কামনা বর্ত্তমানেরই কথা ভাবে, ভবিষ্যতের চিন্তা করে না, রোহিণীও তাহা করে নাই।

তাহার অনিবার্য্য ফলভোগও তাহাকে করিতে হইল। নিতান্ত ক্ষোভে ও দুঃখে ভাঙিয়া পড়িলেও, ভ্রমর গোবিন্দলালকে ঠিকই বলিয়াছিল—"তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" গোবিন্দলালের দুর্ব্বল চিত্ত, সকল মানসমোহিনী রমণীর মত, রোহিণীর অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু সুখের অতিরঞ্জিত আশায় সে অন্যরূপ ভাবিয়াছিল। ভ্রমর যখন গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল, তখন গোবিন্দলালের নিতান্ত অসার, আত্মসুখান্বেষণে লোলুপ ও নিষ্ঠুর চিত্ত ভাবিয়াছিল—"এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।" কিন্তু রূপসেবাকে যে এরূপ লঘু করিয়া ভাবিতে পারে, তাহার নিকট একাগ্রতা বা আন্তরিকতা আশা করা যায় না। রূপসাধনার শক্তি তাহার ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, গোল্লায় যাইতেছি, যাইব, কিন্তু গোল্লায় যাওয়াও নিতান্ত সহজ নহে। বক্ষের তলে যাহার প্রাণ নাই, চরিত্রে স্থৈর্য্য নাই, ত্যাগের কথা দূরে থাক, ভোগ ভুঞ্জিবার ক্ষমতা সে কোথায় পাইবে?

ফলেও তাহা হইল। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের যে আকর্ষণ, তাহা অসত্য ও অসার ছিল বলিয়াই অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সেইজন্য, ব্রাউনিং-এর কবিতার কোনও নায়কের মত, গোবিন্দলাল রূপসেবার স্পর্দ্ধা করিলেও, শেষে অকুণ্ঠভাবে বলিতে পারে নাই—

How sad and mad and bad it was,
But then, how it was sweet!

যদি রূপসেবাই তাহার সঙ্কল্প হইল, যদি রোহিণীর জন্য ভ্রমরকে সে অনায়াসে ত্যাগ কবিল, তবে বোহিণী ও রূপসেবা তাহাব দেহপ্রাণমন পূর্ণ কবিতে পাবিল না কেন? তাহাব কারণ, ভ্রমবকে যেরূপ, রোহিণীকেও সেইরূপ, সে অন্তবেব সহিত গ্রহণ কবে নাই। প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল যখন বোহিণীব সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনও ভ্রমরের চিন্তা তাহাব চিত্ত অধিকাব কবিযা থাকিত। তাহার চঞ্চল চবিত্রে ভাবেব বিস্তাব বা ঐকান্তিকতা ছিল না, অতিস্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ঊর্দ্ধে তাহাব কামনা পক্ষবিস্তাব কবিযা মুক্ত হইতে পাবে নাই। ক্ষুদ্র দাবিদাওয়াব তুচ্ছতা ছাড়িয়া দিযা প্রসন্ন প্রীতিব অবাধ আলোকে সে কোনদিন নিজে দাঁড়াইতে পাবে নাই, বোহিণীকেও দাঁড় কবাইতে পাবে নাই। সে মানসিক বল, সে idealism, সে অতীন্দ্রিয় কল্পনা, পরিমার্জ্জিত চিত্তের সে সহজ উৎকর্ষ তাহাব ছিল না, তাহা যদি থাকিত, তবে নিজেও অধঃপতিত হইত না, বোহিণীকেও অধঃপতিত করিত না। বোহিণীকে সে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল, তাহার বেশি দিবাব প্রবৃত্তি বা সঙ্গতি তাহাব ছিল না। উভয়ের সম্বন্ধের মধ্যে কোনও শ্রদ্ধা, কোনও মায়া, কোনও সত্য ছিল না। বোহিণী জানিত যে, যতদিন গোবিন্দলাল তাহাকে পায়ে রাখিবে, ততদিন সে তাহার দাসী, তাহাব বিলাসের সামগ্রী, নহিলে কেহ নহে। ইহাতে তাহাব নিজেব সম্মান বাড়ে নাই, ববং দিন দিন নিম্নস্তরে নামিয়াছিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে লঘু করিয়া দেখিয়াছিল বলিয়াই নিজে লঘু হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে রোহিণীকেও লঘু হইতে লঘুতর করিয়াছিল। তাই যে-রোহিণী একদিন তাহাব চক্ষে ছিল "তীব্র-জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী, প্রভাতশুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী", আজ তাহাকে সুরুচিবিগর্হিতচিত্রসজ্জিত কক্ষে সামান্য গণিকার মত

ওস্তাদজীর তম্বুরার সঙ্গে তবলা বাজাইয়া, অলস ক্ষণের বিলাসের ক্রীড়াপুত্তলী করিতে তাহার কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় নাই। ইহাই বোধ হয় তাহার আমোদ-প্রমোদের চরম ধারণা। অবশ্য, রোহিণী ঠিক গ্রামের লজ্জাশীলা বধূ ছিল না, কিন্তু যৌবন-চঞ্চলা ও স্বভাবচতুরা হইলেও, গোবিন্দলালের আশ্রয়ে শহরের বাইজীর মত জীবন-যাপনও তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যখন সে বাধাদ্বিধাহীন হইয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিল, গোবিন্দলাল বুঝি পারাবার, কিন্তু অতলে ডুবিয়া সর্ব্ব দেহে ও মনে পঙ্কের ভার মাখাই তাহার সার হইয়াছিল। যে-রোহিণী একদিন মরিতেও ভয় পায় নাই, আজ তাহার নিষ্কৃতির সহজ উপায় যে মরণ, তাহাতে আর সাহস নাই। দুঃখ-ক্রোধের বেগে গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি, রোহিণি, যে তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত যে ভ্রমর—তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম?" ভ্রমরের জন্য আক্ষেপ, স্বাভাবিক হইলেও, যেমন নিরর্থক, রোহিণীর উপর দোষারোপও সেইরূপ অবিচারিত ও অমনুষ্যোচিত। সুতরাং, যাহাকে পঙ্কে টানিয়া আনিয়া দেহে মনে নগ্ন করিয়াছে, সে অসহায় জীবন-ভিক্ষায় কাতর স্ত্রীলোক হইলেও, তাহাকে অনায়াসে হত্যা করিয়া বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনে পলাইয়া বাস করা, তাহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। তাহার মনুষ্যত্ব-হীনতা সেইদিন চরম সীমায় উঠিল, যেদিন সামান্য ভিক্ষুকের মত ভ্রমরের নিকট আশ্রয় ও অর্থ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না।

রোহিণীর এই অধঃপতনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র বিবৃত করেন নাই, আভাসে দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু শুধু "মহাপাপিষ্ঠা" বলিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। এ কথা বলিতেছি না যে, রোহিণী নিরপরাধ, কিন্তু ইংরেজীতে যাহাকে more sinned against

than sinning বলে, হতভাগ্য রোহিণী তাহার শোচনীয় নিদর্শন। যে দুইটি নারীর করুণ জীবন-কাহিনী লইয়া সমগ্র ঘটনাচক্রের গভীর tragedy বা বিয়োগান্ত পরিণাম, গোবিন্দলাল মূলে না থাকিলে সে চক্র ঘুরিত না। কিন্তু তাহারা মরিল, গোবিন্দলাল শেষে পরম শান্তির অধিকারী হইল,—ইহাই কি নিয়তি? হয়তো ইহাই তাহার পরম শাস্তি।

শ্রীসুশীলকুমার দে

"যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি এক বার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে বা একটি মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে? আর ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্ম্মের মোহিনী মূর্ত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভা বড় খাটো হইয়া যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র

উনবিংশ শতকের বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ও বাঙ্গালীর আদর্শের প্রতীক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে, ইহার উৎপত্তি হইতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় পর্যন্ত প্রায় সহস্রবৎসর-ব্যাপী ইতিহাসে, বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রধান লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও কৃতিত্ব উনবিংশ শতকের শেষপাদে বাঙ্গালা সাহিত্যে ও বাঙ্গালীর মানসিক জীবনে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং সে প্রভাব, আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের আরও বিরাট্ প্রতিভার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের যুগেও একেবারে অস্তমিত নহে, বরঞ্চ কোথাও কোথাও বঙ্কিম-প্রতিভার পুনরালোচনার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াসও দেখা যায়—বঙ্কিমের প্রভাব যেন বাঙ্গালীর জীবনে মরিতেছে না, মরিবার নহে।

বঙ্কিমের যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য-গগনে অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিতে ভাস্বর কতকগুলি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছিল—বাঙ্গালীর চিত্ত-গগনে ইঁহারাই যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, মধুসূদন, ভূদেব, বিহারীলাল, রামকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, হরপ্রসাদ, বিবেকানন্দ—ইঁহাদের হাতে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া নূতন ভাবে বাঙ্গালীর মনের কাঠামো গড়িয়া উঠে। ইঁহারা উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে যাহা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, যে আদর্শে ও যে ভাবে বাঙ্গালীর মানসিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস করিয়াছিলেন, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যে তাহা কালস্রোতে অবিকৃত

বা অপরিবর্তিত থাকিবে না, নূতন নূতন অবস্থার আগমনে ও নূতন নূতন ভাবপ্রবাহের অনিবার্য গতিবেগে যে তাঁহাদের রচিত ভাবজগৎ অটুট থাকিবে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তথাপি, ইঁহাদের এবং ইঁহাদের প্রতিভূ-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থকতা কোথায়, ইঁহাদের নিজের যুগের সমাজ বা জগতের গণ্ডীর বাহিরে, ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণের নিকটে সেই সার্থকতার কোনও কার্যকারিতা আছে কি না, অথবা সেই সার্থকতা কেবল ক্ষণস্থায়ী যুগকে অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া তাহার যেটুকু মূল্য তাহা কেবল ঐতিহাসিক আলোচনারই উপজীব্য—ইহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। বঙ্কিমের বাণী কি, এবং তাহার কোনও শাশ্বত অথবা দীর্ঘকালোপযোগী, বিশেষ করিয়া আমাদের যুগের উপযোগী, কোনও মূল্য আছে কি না, একথা এখন বঙ্কিমের জন্মের শত বৎসর পরে ও তাঁহার মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, তাঁহার শতবার্ষিক জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের দিনে, জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—দেশের মহাপুরুষেরা ride on the crest of the wave, যে ভাবপ্রবাহ দেশকে প্লাবিত করিয়া আসিতেছে, তাহার শীর্ষদেশেই আরোহণ করিয়া যেন তাঁহারা আগমন করেন—এবং সকলের দ্বারা সেই প্রবাহের নিয়ন্তা-রূপে সমাদৃত হন। ঊনবিংশ শতকের জাগৃতির ফলে বাঙ্গালীর প্রাণে যে আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, বাঙ্গালীকে যে আদর্শ চিন্তায় ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকেই মূর্ত করেন, দর্শন- ও অনুধাবন-যোগ্য করেন নিজ রচনায়, তিনি শিক্ষিত বিচারশীল বাঙ্গালী জনগণের মনোভাবকে যেন সাহিত্যিক রূপ দিয়া তাহাকে উপলব্ধিযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সেই আদর্শ এখনও মরে নাই, সেই জন্য এখনও বঙ্কিমের বাণীর উপযোগিতা বা সার্থকতা আছে।

ইংরেজের সঙ্গে বাঙ্গালীর যখন ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটিল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে—পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজের হাতে বাঙ্গালা দেশের শাসন-ভার হস্তান্তরিত হইবার পর—তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎসাহে কর্মশক্তিতে প্রচণ্ডরূপে শক্তিশালী ইংরেজের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী বেশ একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল। মানব-ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরেজ অভিজ্ঞ, সমগ্র জগৎ ইংরেজ যেন চষিয়া বেড়াইতেছে, পশ্চাদ্দৃষ্টি ও সম্মুখদৃষ্টি, এবং উদ্দেশ্যময় সজ্ঞান আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকায়, অতুলনীয় শক্তির অধিকারী ইংরেজ, তাহার সামনে বাঙ্গালী গ্রাম্য, বাঙ্গালী দৃষ্টিহীন, বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ, বাঙ্গালী অনিয়ন্ত্রিত—ব্যাপকভাবে সমাজ-জীবন-রক্ষার জন্য বাঙ্গালীর চেষ্টার অভাব। ইংরেজের সঙ্গে সংস্পর্শে বা সংঘাতে, বাঙ্গালীর বিধ্বস্ত হইয়া যাইবারই কথা। কিন্তু বাঙ্গালী অত সহজে বিধ্বস্ত হইল না—নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল, অনেকটা সমর্থও হইল। বাঙ্গালী, বাঙ্গালী থাকিয়াই ইংরেজের কাছ হইতে যুগোপযোগী চিন্তা ও ভাবধারা, সমাজ- ও সংস্কৃতিগত রীতি-নীতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল, এই-সকল নূতন জিনিস হজম করিয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য চেষ্টা করিল। বাঙ্গালীর এই সার্থক চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে।

বাঙ্গালীর জীবনে ১৭৮০ হইতে ১৮৫০ পর্যন্ত ইংরেজী সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের, এবং ইহার সহিত বাঙ্গালা সভ্যতার প্রথম সংঘাতের যুগ। তাহার পরে ১৯১০ পর্যন্ত এই বিদেশীয় সভ্যতা পরিপাকের যুগ। তদনন্তর, বিশেষ করিয়া বিগত মহাযুদ্ধের পরে, বাঙ্গালীর জীবনে ও সংস্কৃতিতে যে অবস্থা আসিয়াছে, সেটী প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজী ও পরোক্ষ-ভাবে অন্য ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা আক্রান্ত, উনবিংশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে গঠিত বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিপন্ন হইয়া পড়ার এবং বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় প্রভাবের ক্রমবর্ধনশীলতার যুগ। বাঙ্গালীর মধ্যযুগের সভ্যতা, অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত যাহার জের চলিয়াছিল, তাহা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা. নাগরিক সংস্কৃতি বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার বৈশিষ্ট্য তাহাতে তেমন ছিল না। এই আদিম-গন্ধী গ্রামীণ সভ্যতায় একদিকে মুষ্টিমেয় পণ্ডিত কতকগুলি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বা বিচার লইয়া আধিমানসিক জগতে বিচার করিতেন বটে, কিন্তু অন্যদিকে ব্যবহারিক জীবনে ঐ সভ্যতা নিতান্ত সরল, এমন কি নির্বোধ ও অজ্ঞান ছিল। সজ্ঞান সমাজ-নিয়ন্ত্রণ শক্তি ইহাতে লোপ পাইয়াছিল, ধীরে-ধীরে ইহা গতানুগতিকতার পঙ্কের মধ্যে নিমগ্ন হইতেছিল। ইহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মজগৎ গ্রামের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। প্রবল-প্রতাপ বিশ্বগ্রাসী ইংরেজী সভ্যতা হঠাৎ আসিয়া তাহার দ্বারে হানা দিল। উহার শক্তিকে বাঙ্গালীর গ্রামীণ সভ্যতা নির্বিরোধে মানিয়া লইল। উহাকে উপেক্ষা করা, উহার সম্বন্ধে কৌতূহলের অভাব পোষণ করা বেশী দিন চলিল না। কতকটা ইচ্ছায় কতকটা অনিচ্ছায় উহার সহিত বোঝাপড়া করিতেই হইল। বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে তখনও সংস্কৃতের চর্চা জীবন্ত ছিল। বাঙ্গালীর দুর্বল গ্রামীণ জীবনে প্রাচীন ভারতের নাগরিক এবং নিখিল-ভারতীয় মহাজীবনের শক্তি সঞ্চারিত করিবার একমাত্র সাধন-রূপে, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য তখনকার বাঙ্গালী চিন্তানেতাদের নিকটে প্রতিভাত হইল। আধুনিক ইউরোপের প্রবল আক্রমণ হইতে বাঙ্গালীর গ্রামীণ সভ্যতাময় জীবনকে বাঁচাইবার জন্য, প্রাচীন ভারতের উদ্বোধন করা হইল। ইউরোপের প্রাচীন, মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের মনীষার সহিত, তাহার হোমর এস্কিলস্ সোফোক্লেস্ এউরিপিদেস্, প্লাতোন আরিস্তোতল,

ভর্জিল হরেসের সহিত, দান্তে ভল্‌তেয়ার্‌ রুসো, শেক্‌স্পিয়র মিল্‌টন্‌, বেকন্‌ গিবন্‌, মিল্‌ স্পেন্সর্‌, শেলি বায়রন্‌ প্রভৃতির সহিত পাল্লা দিবার উপযোগী মনীষা বাঙ্গালী তাহার দাশুরায়, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিতে পাইল না , পাইল, এবং পাইয়া বাঁচিয়া গেল, প্রাচীন ভারতের, তাহার পিতৃপুরুষের জগতের ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি বাণভট্ট শ্রীহর্ষে, উপনিষদ্‌ সাঙ্খ্য যোগে, পাণিনি পতঞ্জলি শঙ্কর রামানুজে। মনীষী রামমোহন রায় এই বোঝাপড়ার কাজে অগ্রণী হইলেন , এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা সভ্যতার সংঘাতের যুগেই তিনি বাঙ্গালী জাতির আপন্ন অবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি উভয়েরই পরিচয় দিলেন। রামমোহন রায়ের পরে, একদল বাঙ্গালী তরুণ, ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপীয় মনের সহিত অতি-পরিচয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত পরিচয়ের অভাব, এই দোটানায় পড়িয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতিকেই সার-বস্তু বলিয়া স্থির করিয়া, ভাবজগতে এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহারই সাধনায় লাগিয়া গেলেন। ইঁহারা হইলেন ইংরেজী সভ্যতার মোহের দ্বারা আবিষ্ট 'ইয়ং বেঙ্গল' দল। ইংরেজী সভ্যতার গৌরবময় সিংহাসনের সামনে ইঁহারা আত্মপরাজয়ের ও আত্মনিবেদনের গান গাহিলেন—"তেরা দরবার শাহানা, মেরী সূরৎ ফকিরানা।" দুই তিন বর্ষদশকের মধ্যে 'ইয়ং বেঙ্গল' দল প্রকৃতিস্থ হইল—ইংরেজী আমলের বাঙ্গালী সংস্কৃতির দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, ইঁহারা দেখা দিলেন। পরে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইলেন। প্রাচীন ভারত ইতিমধ্যে ইউরোপের কৌতূহলের সোনার কাঠির স্পর্শে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং আধুনিক বাঙ্গালীর সংস্কৃতিময় জীবনে ধীরে-ধীরে নূতন

ভাবে তাহাব স্থান করিয়া লইয়াছে। ভারতের—প্রাচীন ভারতের—গৌরব সম্বন্ধে বোধ, এবং ইউরোপেব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রমাণে অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারতেব গৌরবের স্বপ্ন—ইহা বঙ্কিম-প্রমুখ বাঙ্গালী সংস্কৃতি-নেতাদেব চিত্ত ও চিন্তাকে অনুরঞ্জিত কবিল। ইউরোপের নিকট হইতে যাহা গ্রহণযোগ্য, নিজ ভারতীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিযা তাহা গ্রহণ কবিবাব জন্য ইঁহারা প্রস্তুত হইলেন, ভাবত ও ইউবোপ, উভয মহাদেশকেই একসঙ্গে অনুশীলন করিতে ও উপলব্ধি কবিতে তাঁহাবা চেষ্টিত হইলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব এই সমন্বযেব জন্য যে মনোবৃত্তি সাহিত্যের এবং মানসিক সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে দেখা দিল, তাহাতে হিন্দু মনোভাবেব স্বাভাবিক পরমতসহিষ্ণুতা অনেকাংশে কার্যকব হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহাব যুগের পূর্বগামী ও অনুগামী মনীষীদেব বাঙ্গালী ও ভাবতবাসীকে প্রথম দান—নিজ গৌববে নিজেব জাতীয প্রতিষ্ঠাভূমিতে বাঙ্গালীকে ও ভাবতীযকে দাঁড কবানো। প্রাচীন ভারতেব রিক্থকে মাথায় পাতিয়া লইয়া, ইউরোপেব যাহা দিবাব আছে, তাহা গ্রহণ কবা এবং ইউবোপ ও জগতেব অন্যান্য খণ্ডকেও ভারতেব শাশ্বত রিক্থেব অংশভাক্ হইতে আহ্বান কবা, নিজ ঐতিহ্যকে বিস্মৃত না হইয়া, নিজ মর্যাদায় পৃথিবীব আব পাঁচটা সভ্য জাতির মধ্যে ভাবতবর্ষ ও বাঙ্গালা যাহাতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পাবে, বিনির্দিষ্ট পথে তাহাদের কাজ করিয়া যাইতে পাবে, সেদিকে বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, পথ দেখানো। ইউরোপ (বিশেষতঃ আধুনিক যুগে) জগৎকে অনেক কিছু দিযাছে, কিন্তু ইউরোপের লোকেরাও মানুষ—তাহাদের কথাই সব বিষয়ে শেষ কথা নয়, আমাদেরও বলিবার এবং দিবার কিছু আছে; লইবার শক্তি তাহাবই থাকিতে পারে, যাহার দিবার শক্তি আছে;

এইরূপ আত্মমর্যাদাজ্ঞান, সাহস এবং শক্তি লুপ্তচেতন জাতির মধ্যে যাঁহারা আনিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদেব মধ্যে প্রধান, তাঁহাব স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই জন্যই প্রত্যেক বাঙ্গালীর সকৃতজ্ঞ প্রণাম কবা উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সুযুক্তিব এবং অন্তর্দৃষ্টিব আবাহনকারীদেব অন্যতম। তাঁহাব উপন্যাসগুলিতে এবং তাঁহাব নানা প্রবন্ধে এ বিষয়ে ভূবি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই দুইটী বস্তুই যে কোনও জাতির জীবনে সুলভ নহে। নিছক ভাবসাধনা মানুষকে ভাবুক ও কল্পনা-বিলাসী কবিয়া তোলে, তাহাকে দশকর্মেব বা'ব কবিয়া দেয়। জ্ঞানময় দৃষ্টিব মত আব কিছুই সামাজিক বা ব্যবহারিক এবং মানসিক উভয় প্রকাবেব জীবনে অপেক্ষিত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যয়ন আলোচনা ও অনুশীলনেব কঠিন পথ অবলম্বন কবিয়া কর্তব্য নির্ধাবণেব পক্ষপাতী। এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশে পথিকৃৎদেব মধ্যে তিনি একজন—তাঁহাব বোচক উপন্যাস ও নিবন্ধমালাব মাধ্যমে তিনি পবোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে এই মনোভাব স্বজাতীয়দেব মধ্যে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা কবিয়াছেন, তাঁহাব বচনা-সৌধকে এই সদাপ্রদীপ্ত দীপশিখা আলোকিত করিয়া বাখিয়াছে। এই জন্য বাঙ্গালী জনসাধাবণ এখনও তাঁহাব দ্বারা প্রজ্বালিত প্রদীপশিখা হইতে আলোক সংগ্রহ কবিয়া নিজেব মনোজগৎকেও আলোকিত কবিতে পাবেন। বঙ্কিমেব চিবন্তন সার্থকতা এখানেও বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

জাতির জীবনেব সঙ্গে গভীর সমবেদনা বঙ্কিমেব রচনার আর একটী লক্ষণীয় গুণ। এইটী তাঁহার নিবন্ধাবলীতে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। জাতির প্রাণেব ও তাহার সংস্কৃতিব মূলে কি শক্তি আছে তাহা বুঝিয়া, তবে জাতিকে চালিত কবিবাব চেষ্টা করা উচিত, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র

বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে বঙ্কিমের পূর্বে বুঝি আর কোনও বাঙ্গালী মনীষী এতটা সচেতন হন নাই। তাঁহার নিবন্ধাবলীর মধ্যে, রামধন পোদের সংসারের দুঃখ-দৈন্যের অজ্ঞানতা-কুসংস্কারের যে চিত্র তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতের কৃষাণ ও শ্রমজীবীর সহিত গভীর দরদের পরিচয় পাই। দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই সার-ধর্ম বলিয়া বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন; বিবেকানন্দের পূর্বে, বঙ্কিমচন্দ্র দরিদ্র-নারায়ণকে মূর্ত দেখিয়াছিলেন, তাহার সেবার জন্য একটা অব্যক্ত আকুতি জানাইয়াছিলেন। এদিক্ দিয়া বিচার করিলে, বঙ্কিমচন্দ্রকে মানব-প্রেমী দীনবন্ধুদের অন্যতম বলিতে হয়, এবং তাঁহার অবলোকন ও অনুশীলন, এখন যাঁহারা এদেশে জনসেবাকে জীবনে প্রধান স্থান দিতেছেন, তাঁহাদেরও আলোচ্য বলিয়া বলিতে হয়।

বঙ্কিমের কল্পনাময়ী দৃষ্টি তাঁহার জ্ঞানময় আলোচনাকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। দেশের প্রাণকে, দেশের আশা আশঙ্কা শক্তি সাধনা সমস্তকে তিনি দেশমাতা-রূপে কল্পনা করেন—"ভারতমাতা" এই শব্দের মধ্যে যে ভাবজগৎ যে চিন্তাধারা যে চিত্রসম্পুট যে আত্মাহুতির স্পৃহা বিদ্যমান, তাহার আবাহনকারী বঙ্কিমচন্দ্র, "বন্দে মাতরম্" গান এই হিসাবে কেবল vers d'occasion অর্থাৎ সাময়িক উচ্ছ্বাসের প্রকাশক কবিতা নহে—ইহা ভারতের শাশ্বত-মহিমার সামগান, ভারতের বাহ্য-প্রকৃতির, ভারতের সভ্যতার, ভারতের আত্মার উদ্বোধক রাষ্ট্রসংগীত। প্রাণ দিয়া দেশকে ভালবাসিয়া, দেশকে মহিমমণ্ডিত করিবার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা বঙ্কিমে যে ভাবে আমরা পাই, আধুনিক ভারতের খুব কম লেখকের মধ্যেই তাহা দেখা যায়।

শেষ কথা—বঙ্কিমের রসসৃষ্টি। এ বিষয়ে বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যে

যেমন একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তেমনই তিনি নব-নব বিষয়ের উন্মেষক। সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মধ্যে রসের উৎস তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আবার অতীতকে আবাহন করিয়া তাহার মধ্যে নিহিত রসবস্তুকেও তাঁহার অভিনব ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'কপালকুণ্ডলা'র মত সাহিত্য-বিষয়ে একখানি চরম-সৃষ্টি বঙ্কিমের অপূর্ব প্রতিভার পরিচায়ক। রস-রচনার দিক হইতে দেখিলে, তাঁহার রচনাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং ভারতীয় সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্ব-সাহিত্যেও মানবের চিরন্তন চিত্তসুখের ভাণ্ডার হইয়া বিরাজ করিবে, এবং কেবল গৌড়জন বা ভারতীয়জন নহে, বিশ্বজনও তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না।"

বাংলা উপন্যাসের গোড়ার কথা ও বঙ্কিমচন্দ্র

গল্প শোনার বাসনা মানুষের চিরন্তন। যে অসভ্য জাতির সাহিত্য নাই তাহারাও গল্প শোনে। যাহাদের সাহিত্য আছে সে জাতিও যে সব সময়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়া গল্প শোনার বাসনা চরিতার্থ করে তাহা নহে। মুখে শোনা গল্প আর সাহিত্যের মধ্য দিয়া পাওয়া গল্পের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। মুখে শোনা গল্পে কাহিনীটাই মুখ্য, কাহিনী-চরিত্রগুলি শ্রোতার কল্পনাই জীবন্ত করিয়া লয়। সাহিত্যের গল্পে কাহিনীর সহিত চরিত্রসৃষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ, ইহাতে গল্পের চরিত্র পাঠকের সম্মুখে সমগ্রভাবে উপস্থাপিত হয়, পাঠকের কল্পনার বিশেষ অবকাশ থাকে না।

প্রাচীন বাংলা ছিল একান্তভাবে ধর্ম্মমূলক, অর্থাৎ পুরাতন বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল দেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপক অথবা লীলাকাহিনী-বর্ণনাত্মক। কিন্তু সেই সঙ্গে কোন কোন প্রাচীন কাব্যে তখনকার দিনের লৌকিক গল্প বা উপকথা কতক কতক দেবমাহাত্ম্যকাহিনীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যান, ষষ্ঠীমঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল প্রভৃতি ব্রতকথা জাতীয় কাব্যের কাহিনী—এই সবের মূলে আছে প্রাচীন বাংলার গালগল্প। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যকে মূলত প্রাচীন রাঢ়ের উপকথা-সংগ্রহ বলিলে ইতিহাসের অমর্য্যাদা হইবে না।

মুসলমান রাজদরবারের মারফত বাংলা সাহিত্যে উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক কাহিনী বা **adventure tales** প্রথম আমদানি

হইল। এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে বিদ্যাসুন্দব উপাখ্যানই প্রথম আসে। যতদূর জানা গিয়াছে, বাংলা ভাষায় প্রথম বিদ্যাসুন্দব কাব্য রচিত হয় ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তাহার দুই চাবি বৎসব পূর্ব্বে। এই কাব্যেব কবি শ্রীধবেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গৌড়েব সুলতান নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ শাহেব পুত্র যুববাজ অলাউ-দ্-দীন ফীরূজ শাহ্। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীকে ধর্ম্মেব মোড়ক পবাইয়া কালিকামঙ্গলরূপে উপস্থাপিত কবা হইযাছিল বলিযা এই কাহিনী পুবাতন বাংলা সাহিত্যেব অবনতির সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমে ভাগীবথীব তীববর্ত্তী অঞ্চলে যেখানে উত্তবপশ্চিমাঞ্চলেব নাগবিক সভ্যতা ও বিলাসিতাব সর্ব্বাধিক প্রসাব ছিল সেই অঞ্চলে বিশেষ সমাদব লাভ কবিয়াছিল। আবাকান বাজসভাব মাবফত উত্তবপশ্চিমাঞ্চলেব সেই সব adventure tales-এব আমদানি হইল, সেগুলি ধর্ম্মকঞ্চুকাবৃত না থাকায একেবাবেই প্রসাব লাভ কবিতে পাবে নাই। কেবল চট্টগ্রাম অঞ্চলেব মুসলমান সম্প্রদাযের মধ্যে এই সব কাহিনী কিছু কিছু সমাদৃত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতে বিক্রমাদিত্যেব কাহিনী এবং অনুরূপ আখ্যাযিকা বিশেষ জনপ্রিয হইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীব গোড়াব দিকে বিক্রমাদিত্যেব কাহিনী ছাড়া শুকসপ্ততি, গোলেবকাওলী, চাহাব দববেশ, হাতেম তাই ইত্যাদি সংস্কৃত, হিন্দী এবং ফারসী উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দবেব অনুকবণে লেখা চন্দ্রকান্ত, কামিনীকুমার ইত্যাদি গুপ্তপ্রণয়কাহিনী বাঙালী পাঠকেব গল্পপিপাসা মিটাইতে লাগিল। ইংরেজী হইতে অনূদিত আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস ইত্যাদি কাহিনীও বিশেষভাবে আসর জাঁকাইয়া তুলিল।

উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাময়িকপত্রের প্রবর্ত্তন

হইল। ইহা হইতেই আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত। অনেকেরই ধারণা আছে যে, আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কেরী এবং তাঁহার সহকারী পণ্ডিত এবং মুন্সীদের দ্বারা। এ ধারণা সর্ব্বাংশে যথার্থ নহে। বাংলা গদ্যের যথার্থ আরম্ভ পোর্ত্তুগীস ও বাঙালী রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের দ্বারাও নহে। বাংলা গদ্যের প্রবর্ত্তন, পরিপুষ্টি এবং প্রতিষ্ঠা হয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের দ্বারা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একাধিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ন্যায় এবং স্মৃতি গ্রন্থের বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, অনেক বৈদ্যও বৈদ্যকগ্রন্থের তরজমা করিয়াছিলেন। কথকদের পুঁথিতে বাংলা গদ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সত্য বটে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা বাংলা গদ্যে (এবং সম্ভবত পদ্যেও) খ্রীষ্টানী পুস্তিকা রচনাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং ইহাও সত্য যে, এই খ্রীষ্টানী বাংলার চর্চ্চা অব্যাহতভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অবধি চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, বাঙালী জনসাধারণ এই খ্রীষ্টানী সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া দূরে থাকুক, ইহার অস্তিত্বের বিষয়েও সচেতন ছিল কি না গভীর সন্দেহের বিষয়। খ্রীষ্টানী বাংলা সাহিত্যের ধারার সহিত মূল বাংলা সাহিত্যের সংস্রব কখনও ঘটে নাই।

তেমনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদিগের রচিত বাংলা গদ্য-পাঠ্যপুস্তকও কোনদিন সাহিত্য হিসাবে গৃহীত হয় নাই। এবং এই পাঠ্যপুস্তকের গদ্য সংস্কৃত এবং উন্নত হইয়া কোনদিন বিদ্যাসাগরী সাধুভাষায় পরিণত হয় নাই। বিদ্যাসাগর যে গদ্য পাইয়া সংস্কৃত এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ফল্গুস্রোতোবাহিনী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গদ্য এবং তাহা বাংলা সাময়িকপত্রের গদ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙালী পাঠকসাধারণ যাহাতে অবিমিশ্র সাহিত্যরস পাইত, তাহা হইতেছে সে যুগের সাময়িকপত্র—প্রধানত সমাচারদর্পণ, সমাচারচন্দ্রিকা, সংবাদপ্রভাকর, বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ, বিকাশ এবং পরিণতি হইয়াছে সাময়িকপত্রিকার পৃষ্ঠায়। সমাচারচন্দ্রিকায় ভবানীচরণ, সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বব গুপ্ত ও তাঁহাব শিষ্যবর্গ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগব মহাশয়, বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে রাজেন্দ্রলাল, বিচারক ও অবোধবন্ধুতে বিহাবীলাল এবং কৃষ্ণকমল, মাসিক পত্রিকায় প্যারীচাঁদ—ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সে যুগেব সাময়িকপত্রে লেখনী পবিচালনা কবিতেন। মধুসূদনেব অমিতাক্ষব ছন্দঃ প্রথম আবির্ভূত হয সামযিকপত্রেব পৃষ্ঠায, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেব প্রথম প্রকাশ ঘটে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে।

বিদ্যাসাগরেব যুগে সংবাদপ্রভাকব, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, মাসিক পত্রিকা, বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ, বিচাবক, অবোধবন্ধু ইত্যাদি,—বঙ্কিমেব যুগে বঙ্গদর্শন, বান্ধব, সাধারণী, নবজীবন, প্রচার, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী ইত্যাদি,—এবং বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথেব যুগে ভাবতী, সাধনা, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), প্রবাসী, সবুজপত্র, নারায়ণ, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সাময়িক-পত্র বাংলা সাহিত্যেব অপরিসীম পৌষ্টিকতা করিয়াছে।

বাংলা সাময়িকপত্রেব সৃষ্টিকাল হইতেই কিছু কিছু কৌতুকরচনা ও ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও একাধিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাযেব নববাবুবিলাস এই ধরণের একটি চমৎকাব বই। পরবর্ত্তী কালেব অনেক ব্যঙ্গরচনায় নববাবুবিলাসের প্রভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয।

এমন কি প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরে দুলালে এবং দীনবন্ধুর একাধিক নাটকে নববাবুবিলাসের কয়েকটি motif অনুকৃত অথবা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে দেখা যায়। এক হিসাবে বলিতে গেলে, এই ব্যঙ্গ-চিত্রের মধ্যেই আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা রহিয়াছে। গল্প-উপন্যাসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হইতেছে—বাস্তব অথবা বাস্তববৎ প্রতীয়মান জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি। এই লক্ষণ কিছু পরিমাণে এই ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে আছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা, সীতার বনবাস, তারাশঙ্করের কাদম্বরী, রামগতির রোমাবতী, প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল, কৃষ্ণকমলের দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ ও পৌলবজ্জিনী ইত্যাদি উৎকৃষ্ট কাহিনী থাকিলেও বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছিল একেবারে স্বাধীনভাবে।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করিলেন। ইংরেজীর অনুসরণ হইলেও এ হইল সম্পূর্ণ নূতন এবং স্বাধীন সৃষ্টি। বাঙালী পাঠকসাধারণ এবং সাহিত্যরসিকের নিকট মহোৎসবের ভাণ্ডারদ্বার মুক্ত হইল।

উপন্যাস-রচনার প্রধান অঙ্গ তিনটি—বিষয়বস্তু বা প্লট, রচনারীতি বা style, এবং বাস্তবকল্প চরিত্রসৃষ্টি বা characterization। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিন বিষয়ের কৃতিত্ব বিচার করিয়া দেখি। বলিয়া রাখি, এই বিচারে বঙ্কিমের উপন্যাসের সাধারণ ধর্ম্ম লইয়াই বিচার করিব, কোন বিশেষ শ্রেণীর অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট একটি উপন্যাসের কথা বলিব না।

বাহ্যদৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির যে ভাবে শ্রেণীবিভাগ করি না কেন, সবগুলিই একটি সাধারণ শ্রেণীতে পড়ে, বঙ্কিমের সব

উপন্যাসই মূলত রোমাণ্টিক নভেল। ঘটনাপ্রবাহের দ্রুতগতিতে এবং নাটকোচিত ঘাতপ্রতিঘাতে প্লট সর্ব্বত্রই ঘোরাল। প্রধান রসের যোগান দিয়াছে নারীপ্রেম; শেষের কয়েকটি উপন্যাসে তাহার সঙ্গে দেশপ্রেমের প্রবাহ মিশিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা অথবা উপনায়িকার অব্যক্ত প্রেমের অচরিতার্থতা করুণ সুর বা tragic element ধ্বনিত করিয়া প্লটের মোহকারিতা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে।

রচনারীতি বা style-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা অপূর্ব্ব। বঙ্কিমের পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে যে ব্যঙ্গচিত্র বা আখ্যায়িকা ছিল, তাহাতে গ্রন্থকারের ভূমিকা ছিল মধ্যস্থ (impersonal) বক্তার বা কথকের। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখকের ভূমিকা হইল বিশ্রব্ধ (intimate) বন্ধুর। এখানে গল্প বা কাহিনীটা যেন তেন প্রকারেণ বর্ণনা করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, পাঠকের পরিচর্য্যা বা entertainment করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইংরেজীতে বলিতে গেলে যাহা intimate style, বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে বঙ্কিম তাহাই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বঙ্কিমের লেখার ভাষা ভাবের উপযোগী এবং অনুগত, ভাষা কোথাও ভাবকে ছাড়াইয়া স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। এই কারণে বঙ্কিমের লেখায় ব্যাকরণগত অসঙ্গতি থাকিলেও কুত্রাপি তাহা দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট বাংলা সাধুভাষার গদ্যে বঙ্কিম নমনীয়তার সঞ্চার করিয়া তাহাকে সকল বিষয়, ভাব এবং রসের বাহন হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন। মুখের ভাষা মনের ভাষা হইয়া গেল।

তাহার পর চরিত্রসৃষ্টির কথা। প্রথমে বলিয়া রাখি যে, সাহিত্যে বাস্তবতা বলিলে বস্তুতন্ত্রতা বা realism নাও বুঝাইতে পারে। যে বস্তু (অর্থাৎ বিষয়, ব্যক্তি বা ভাব) ইতিহাসে সত্য নহে, তাহার ভাবের

দিক দিয়া সত্য হইতে কোন বাধা নাই। বস্তুনিরপেক্ষ ভাব বা আদর্শগত বাস্তবতা অর্থাৎ idealism সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। বস্তুসাপেক্ষ বিষয় বা ভাবকে সাহিত্যের উপযোগিতা লাভ করিতে হইলে সাহিত্য-প্রতিভার পুটপাকে জারিত হইয়া সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যাহা "রস" বলে তাহাতে পরিণত হইতে হইবে। তখন আর ইহা সাধারণ অর্থে বাস্তব বা realistic থাকিবে না, বস্তুসাপেক্ষ হইয়াও বস্তুনিরপেক্ষ আদর্শগত বাস্তবতা লাভ করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র সবই বাস্তব,—এই অর্থে যে, ইহাদের মধ্যে বাঙালী মানুষের স্বভাবগত দোষগুণ জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া "রস" বা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসেই প্রতিনায়ক আছে, কিন্তু ইংরেজীতে যাহাকে বলে villain ঠিক সেই চরিত্র নাই বলিলেই হয়। প্লটের ঘটনাপ্রবাহে আবর্ত্ত তুলিয়াছে নায়িকা বা প্রতিনায়িকারা, প্রতিনায়কেরা নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল বাঙালী ঔপন্যাসিকের লেখাতে দেখা যায় যে পুরুষ অপেক্ষা নারীচরিত্রই ফুটিয়াছে ভাল, প্লটে তাহাদেরই প্রাধান্য, পুরুষচরিত্রের নহে। ইহার কারণ বাঙালীর মানসিক জীবনের মধ্যেই মিলিবে। বৃহত্তর জীবনের সহিত বাঙালীর যোগ জাতি-হিসাবে নাই বলিলেই চলে, তাহার কল্পনা ঘরগৃহস্থালী ছাড়িয়া অল্প দূরই বিচরণ করিতে পারে। সুতরাং বাঙালী ঔপন্যাসিকের লেখনীচিত্রে যে আমাদের "সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী"-রাই স্ফুটতর বিকাশ ও বর্ণসুষমা লাভ করিবে তাহাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

শ্রীসুকুমার সেন

"সুখ দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত?"

(৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)

বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবন

তাহাদেরই সেই অধীর আর্ত্তনাদ রূপান্তরিত হইয়া যে অধ্যাত্ম-করুণ আকুতির আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা যেমন সত্য তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-জীবনের শেষ উক্তি। এই নূতনকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

হায় নূতন। তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর। তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটুখানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটুখানি আমাদের কাছে পুরাতন, অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন।…নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে—অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? যেদিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেই দিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। তত দিন এসো, আমরা বুক বাঁধিয়া, হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

ইহাই রূপপিপাসার রূপান্তর—ইন্দ্রিয়ার্থ কেমন করিয়া পরমার্থে পরিণত হয় তাহারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমার প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিহৃদয়ের আলেখ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব। যে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবন ও তথা কবিপ্রতিভার বিকাশের মূলে রহিয়াছে, সেই সর্ব্বনাশিনী শক্তিকে তিনি কত রূপে কত ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাঁহার প্রাণ কত মন্ত্রই পাঠ করিয়াছে! 'বিষবৃক্ষ' হইতেই বঙ্কিমের প্রতিভার পূর্ণ দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়—এই দীপ্তি তাঁহার শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' পর্য্যন্ত সমভাবে উজ্জ্বল

রহিয়াছে, বরং শেষ তিনখানি উপন্যাস—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'ই বঙ্কিমের কবিজীবনের পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়—আর্টের কথা বলিতেছি না, 'completed personality'-র কথা বলিতেছি। প্রতিভার পরিণত অবস্থায়, বঙ্কিমচন্দ্রের রূপতান্ত্রিক সাধনায়, দুই বাব আসন টলিতে দেখিয়াছি। যে পুরুষ-প্রতিভা নারীকেই শক্তি সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আদি প্রতিমারূপে পূজা করিয়াছে, এবং 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—বলিয়া পুরুষকেই সর্ব্ববিধ সন্তাপের জন্য দায়ী কবিয়াছে, সেই কবি তাঁহার দুইখানি উপন্যাসে নারীর প্রতি সহসা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। শৈবলিনী ও রোহিণী রূপে নারী তাঁহার হস্তে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহাতে কবিমানসের একটি অসুস্থ উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে, সুস্থ কবিদৃষ্টির পরিচয় তাহাতে নাই। সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে, এই দুই নারী-চরিত্রই তাহাদের দেহমনের উৎকর্ষ ও বলিষ্ঠতাব জন্য পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহারা কেহই যে সাধারণ নারী নয়—তাহারা যে more sinned against than sinning, সে ধারণার জন্য লেখক নিজেই দায়ী। অতএব এ যেন তাহাদেব দোষ নয়, কবির নিজ হৃদয় যেন সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, কবিপ্রেরণার উপরে ব্যক্তিমানসের পক্ষপাত জয়ী হইয়াছে—নিজের হৃদয়কেই নির্ম্মম আঘাত করিবার জন্য তিনি যেন অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। যে নারীকে তিনি পুরুষের শক্তিরূপিণী সহচরী, তাহার হৃদয়ের যত কিছু ঐশ্বর্য্যের প্রেরণারূপিণী, এবং মিথ্যা ও কাপুরুষতার শাস্তিদায়িনী রূপে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাকেই এখানে শাস্ত্রকারদিগের মত পাপের মূল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। ইহার কারণ সন্ধান করিতে হইলে কাব্য হইতে চক্ষু তুলিয়া কবির প্রতি নিবদ্ধ করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগুলি

কেবল কবিকল্পনার ফুল ফল নহে, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রাণের অতিশয় বাস্তব উৎকণ্ঠাকেই ভিত্তি করিয়া একজন পুরুষব্যক্তির চরিতচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের যাত্রাপথ অতিবাহনের মত, এইগুলির ভিতর দিয়া কবি বঙ্কিম তাঁহার জীবনের গহন পথ অতিক্রম করিয়াছেন, সে পথে সংশয় শঙ্কট আছে, বিপদ বিভীষিকা আছে, উৎসাহ অবসাদ আছে। 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কবিজীবনের সেই দ্বন্দ্ব-সংশয় আর্টের দাবিকে পূরা স্বীকার করে নাই, রসকল্পনার মুক্তপ্রবাহে আপনাকে ছাড়িয়া না দিয়া, কবিচিত্ত সেই প্রবাহেরই প্রতিমুখে আত্ম-শাসনের শিলাস্তূপ বসাইয়াছে। তথাপি প্রাণের কি আকুল আক্ষেপ! বালক প্রতাপ বালিকা শৈবলিনীকে ভালবাসিয়াছে—

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কালপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতি মাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।...

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এজন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

ইহাই প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবন-নাট্যের নিয়তিসূত্র। প্রতাপের কথায় কবি যেমন আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, নিজেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন—'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে', তেমনই শৈবলিনী সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর যাহা বলিতেছে, তাহাও কি কবিরই নিজ-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নয়?

তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুঁতি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে

রক্ষা করিয়া, আলস্যবশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন।...বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে।...চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ?...আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?

চন্দ্রশেখর বলিতেছে, "ছি, ছি, তাহা পারিব না।" কিন্তু পারিব না বলিলেই তো অব্যাহতি নাই। ইহার কয়েকদিন পরেই বিদেশ হইতে "গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদ সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ। আমি ভগবদ্‌বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতে ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।"

চন্দ্রশেখরের মত পুরুষেরও পরিণাম এই। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 'চন্দ্রশেখর', তাহার কারণ চন্দ্রশেখরকে তিনি আদর্শ চরিত্ররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কল্পনা সফল হয় নাই—প্রাণের প্রচণ্ড স্রোতে শিলাস্তূপ ভাসিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখর-চরিত্রের সাত্ত্বিক কঠোরতা তিনি মানবীয় হৃদয়বৃত্তির দ্বারা শোধন করিয়া যে আদর্শ সৃষ্টি

কবিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে—চন্দ্রশেখর শ্রদ্ধা অপেক্ষা কৃপাব পাত্র হইয়াছেন। শৈবলিনী পাপীয়সী—অন্যপূর্ব্বা ও কুলত্যাগিনী, সেই পত্নীকে একরূপ শুদ্ধির দ্বারা পাপমুক্ত কবিয়া সে যখন ঘরে তুলিয়া লইতেছে, তখন তাহাতে তাহাব অপাব করুণা ও স্নেহ অপেক্ষা দুর্ব্বলতাই অধিক প্রকাশ পাইযাছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেব সঙ্কল্প রক্ষা কবিতে পাবেন নাই, শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপেব পাশে এই চবিত্র অতিশয় ম্লান হইয়া পডিযাছে। যেন কবিবই পবাজয় ঘটিযাছে—যে নারীকে তিনি শেষ পর্য্যন্ত অপরাধিনী কবিয়া বাখিয়াছেন, প্রতাপেব মত ইন্দ্রিয়-জয়ী বীব তাহাবই জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন কবিল। কেন কবিল? প্রতাপের জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচাবী যাহারা তাহাবা সে কথা বুঝিবে না। সে কাবণ নিশ্চযই কেবল ইহাই নহে যে, "বাল্য-প্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে"। এ সব কিছু নয়!—কাবণ সেই এক, সেই ব্যাধিই বঙ্কিম-প্রতিভাব সঞ্জীবনী অমৃতবল্লবী।

কিন্তু এই রূপমোহেব, এই ইন্দ্রিয-পাববশ্যেব চূডান্ত ট্র্যাজেডি—'আনন্দমঠ'। যাঁহারা এই উপন্যাসকে একখানি উদ্দেশ্যমূলক স্বদেশ-প্রেমেব কাব্য বলিযাই সংক্ষেপে ইহাব বিচাব শেষ কবেন, তাঁহাবা বঙ্কিমচন্দ্রেব কবিপ্রতিভাব সম্যক ধাবণা কবিতে পাবেন নাই। এই উপন্যাসও 'সীতাবামে'ব মতই বঙ্কিমচন্দ্রেব পবিণত প্রতিভাব অন্যতম নিদর্শন। কোনও একখানি উপন্যাসেব বিস্তৃত আলোচনা এ প্রসঙ্গেব বহির্ভূত, তথাপি যে সূত্র ধবিযা আমি বঙ্কিমচন্দ্রেব কবিচরিত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই প্রয়োজনে এখানে দুই চাবি কথা বলিব। সকল বড কাব্যের লক্ষণই এই যে, তাহাতে জীবনের একটা জটিল ও গভীর অভিজ্ঞতা কোন একটি বিশিষ্ট ভাবকল্পনার ঐক্যসূত্রে সুসম্বদ্ধ আকাব ধাবণ কবে। 'আনন্দমঠে' দেশপ্রেমের কল্পনাসূত্রে কবি

বঙ্কিম তাঁহার আজীবন সঞ্চিত গভীর ও জটিল অভিজ্ঞতাকেই একটি রসরূপ দান করিয়াছেন। দেশপ্রেমকেই পুরুষের একটি মহৎ ধর্ম্মরূপে স্থাপন করিয়া তিনি সে একই সমস্যাকে—বাস্তব ও আদর্শের বিরোধকে, দেহ-আত্মার দ্বন্দ্বকে—আরও সবল স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতে চাহিয়াছেন, যেন দেশপ্রেমের তাড়িত-শক্তি উৎপন্ন করিয়া, তাহার রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে, মানুষের দেহমনপ্রাণকে তরলিত ও মথিত করিয়া তিনি মনুষ্যত্বের মূল উপদান পরীক্ষা করিয়াছেন। দেশপ্রেম-রূপ একটা ভাবাবেগমূলক ধর্ম্মের সংঘাতে, মানুষের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক যত কিছু সংস্কারকে বিধ্বস্ত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তিনি তাহার শক্তি ও অশক্তির সীমা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির ঘনীভূত একাগ্র কল্পনায়—যৌনপ্রবৃত্তি বা রূপমোহ, দাম্পত্য-প্রেম, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার সংসার-ত্যাগ বা সন্ন্যাসের আদর্শ, যুগধর্ম্ম ও সনাতন শাশ্বত পন্থা—এই সকলই একটি ভাব-সত্যের আশ্রয়ে সুসমাহিত হইতে পারিয়াছে। এই গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি নৈশ-গম্ভীর অরণ্যচ্ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাতে যে একটি atmosphere বা মনোভূমির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেজন্য চরিত্র ও ঘটনাগুলির মধ্যে যে ভাবগত সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির নিদর্শন। এইজন্য 'আনন্দমঠ' কেবল দেশপ্রেমের উদ্দেশ্য-মূলক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য নয়, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত লেখনীর একখানি উৎকৃষ্ট রসরচনা। কিন্তু এ আলোচনা এখানে অবান্তর। আমি 'আনন্দমঠ' হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিব—এই উপন্যাসের ভবানন্দ-চরিত্রে রূপমোহের যে ট্র্যাজেডি একেবারে আদিম—elemental—প্রচণ্ডতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কথাই বলিব। প্রতাপের আত্মহত্যা ও ভবানন্দের আত্মহত্যা তুলনা করিলেই বুঝিতে

পারা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষের জীবনের এই অগ্ন্যুদ্গম এখানে আরও কি ভীষণরূপে কল্পনা করিয়াছেন; ভবানন্দের জীবনে ইহার আকস্মিকতা, ইহার অনিবার্য্যতা এবং ইহার বিষ-বিসর্পের অমোঘতা যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। ভবানন্দ-চরিত্রই 'আনন্দমঠে'র সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র—প্রাণের প্রাবল্যে, পৌরুষনিষ্ঠায়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিদ্যাবত্তায়, মহত্ত্বে ও দুর্ব্বলতায়—বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটিকে অতি যত্নের সহিত ভূষিত করিয়াছেন। সেই ব্রতধারী সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক পুরুষ—প্রেম নয়, প্রেমকে দূরে রাখিবার মত বৈরাগ্যসাধনা সে করিয়াছে—শেষে, প্রকৃতির প্রতিশোধের মতই, দারুণ রূপমোহের বশীভূত হইল। মোহগ্রস্ত হইয়াও সে জ্ঞান হারাইল না—তাহার বিবেক বা আত্মজ্ঞান অটুট হইয়া আছে। যেন কোন হিংস্র পশুর গ্রাসে নিরুপায়ভাবে সে তাহার দেহ সমর্পণ করিয়াছে, মনে মনে বলিতেছে, "যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্য ঘটিবে।" অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কিন্তু মস্তিষ্কের বিকৃতি নাই, তাই এ ট্র্যাজেডি এত ভীষণ। কল্যাণীর সহিত কথোপকথনে তাহার যে নিদারুণ অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে—নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণে এমন দক্ষতা, চরিত্রগত মূল তত্ত্বটিকে অবস্থা ও ঘটনার মুখে, এমন করিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মত উদ্ভাসিত করিবার ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যে ঐ একজনেরই ছিল। আমি সেই কথোপকথনের একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

ভবানন্দ। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

কল্যাণী। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তানধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল?

ভব। অতল জলে।

ক। এই মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য সব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ।...আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে।...চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, সন্তানধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়-পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত, কেন না, আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।...

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুথি পড়িতে বসিল।

ভবানন্দ মরিল, এ চরিত্রের পক্ষে এ অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য্য, তাই সে মরিল। প্রতাপ বলিয়াছিল, "আমার ভালবাসার নাম—জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা", ভবানন্দ কি বলিবে? কবি নিজেই তাহার হইয়া বলিয়াছেন, "হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্।"

কথিত আছে, এই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হইয়াছিল। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত বড় বিদ্বান, বলুন দেখি, মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম কি?" উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলিয়াছিলেন, "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ।" বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মের যে আদর্শ সন্ধান করিয়াছিলেন, সে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ নয়—বিবেকানন্দের হইলেও হইতে পারিত। মানুষের মনুষ্যত্বই ছিল সে ধর্ম্মের ভিত্তি, সেই মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণ বিকাশই ছিল তাহার শেষ কথা—দেহবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক আদর্শকে তিনি কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই। তাই মনে হয়, সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণকে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাই জোর করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকটে অত্যুচ্চ আদর্শবাদের কোন মূল্য নাই। ঐ বাক্যের মধ্যে আরও একটি ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে—সে ভাব ধিক্কারের ভাব। শক্তি ও সৌন্দর্য্যের উপাসক, ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার ঘোর শত্রু, জীবনরসরসিক এই মনীষী কবি মানুষের মনুষ্যত্ব-মহিমা সম্বন্ধে যতই আশ্বস্ত হউন—সেই মনুষ্যত্বের তলদেশে যে পঙ্ক রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটা ধিক্কারের ভাব কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

৫

এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করিলাম, তথাপি শেষ করিবার পূর্ব্বে আরও দুই চারিটি কথা বলিবার আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিজীবনের

যে কাহিনী আমি রচনা করিয়াছি, তাহা হইতে অনেকের মনে যে দুই একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে, সর্ব্বশেষে তাহারই উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ আলোচনা কবিব। তাহার মধ্যে একটি এমন হইতে পারে যে, প্রেম বা রূপমোহ কবিকল্পনার অতিশয় সাধারণ উদ্দীপন-বস্তু, ইহাতে আব নূতনত্ব কি আছে? নূতনত্ব না থাকাই কবিকল্পনার গৌরব—যাহা সার্ব্বজনীন ও শাশ্বত তাহাই শ্রেষ্ঠ কাব্যেব প্রেবণা হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাধাবণ ও সুলভ বস্তুকেই কোন্ নূতন অর্থে নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন, আশা করি, এই আলোচনায় আমি তাহা কিয়ৎ-পবিমাণেও নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছি। দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন এই। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-প্রেমেব কবি, এমনই একটা সঙ্গত ধারণা প্রচলিত আছে, আমাব আলোচনায় সে দিকটি বাদ পড়িয়াছে। ইহাব কারণ, আমি এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব কবিজীবনের কবিপ্রবৃত্তির মূল সন্ধান করিয়াছি, তাঁহার মনোগত আদর্শ অপেক্ষা প্রাণগত উৎকণ্ঠাব পবিচয় করিয়াছি। দাম্পত্য-প্রেম, স্বজাতি-প্রীতি, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি যে সকল ভাব ও চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রেব কাব্যরচনাব উপাদান-উপকরণ হইয়াছে, সেগুলির আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত।

আর একটি প্রশ্ন এই যে, আমি যে প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বকে এই প্রসঙ্গে মুখ্য-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং তাহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবাদের যে আদর্শ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতে এক প্রকার দেহবাদেরই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমি এ যুগের সংস্কার-বশে সে যুগের বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যপ্রেরণায় ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের ছায়া দেখিয়াছি। ইহার উত্তবে প্রথমত ইহাই বলিব যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যেমন, তেমনই আমারও মনের কোণে, কোন তত্ত্বের বালাই নাই। যে নিয়তি সমগ্র সৃষ্টি বা দেহ-জগতের নিয়তি, তাহার স্বরূপ-রূপের

সাক্ষাৎকার সকল কবি মনীষী ও মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষের চেতনা-গহনে ঘটিবেই —চিরদিন ঘটিয়াছে। কবি, ঋষি, দার্শনিক, ধর্ম্মপ্রণেতা—কে কি ভাবে তাহার সহিত বোঝাপড়া করে, সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, এই সাক্ষাৎকার তত্ত্বজ্ঞানের মত নয়; প্রথমে তাহাকে তত্ত্বরূপে অবগত হইয়া পরে তাহার প্রেরণায় সত্যকার কাব্যরচনা হয় না, ইহা যে কত সত্য অতি-আধুনিক কাব্য-সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। হিন্দু বা ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ধারায় প্রকৃতি-পুরুষের এই দ্বৈত-রহস্যকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কত সাধক অপরোক্ষ করিয়াছেন—তত্ত্বরূপে নয়, মন্ত্ররূপেই তাহা সাধনার সহায় হইয়াছে। তন্ত্রের শিবশক্তিবাদ এই রহস্যকে স্বীকার করিয়াছে, সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছে। হিন্দু-চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত, নব্য ইউরোপীয় দর্শনের অন্যতম নেতা, দার্শনিকপ্রবর শোপেনহায়র যে অন্ধ নিয়তিকে সৃষ্টির আদিতত্ত্বরূপে ভাবনা করিয়াছেন তাহাও এই কাম—তন্ত্রের সেই মহাশক্তি—কামাখ্যা। আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি শোপেন-হায়রের এই মন্ত্রদৃষ্টিকেই যেন এক নূতন রসকল্পনায় মণ্ডিত করিয়াছেন। এ রহস্যের আদিও নাই, অন্তও নাই—ইহা যেমন পুরাতন, তেমনই নূতন। যাহারা তত্ত্ববিলাসী, যাহারা দেহ-আত্মার পরিবর্ত্তে মানস-আত্মার অভিমানী—দেহাধিষ্ঠিত পরমপুরুষের পরিবর্ত্তে যাহারা একটা স্বতন্ত্র 'অহং'এর সাধনা করে, তাহারা আধ্যাত্মিকতার ধারও ধারে না, তাই সকল আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার মূল যাহা তাহাকেই 'দেহবাদ' নাম দিয়া অন্যান্য 'বাদ'এর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকে। আজিকার দিনে দেহের কোনও মর্য্যাদা নাই, মনই দেহের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাই দেহের পাপও আর পাপ নয়, দেহের প্রেমও প্রেম

নয়। এজন্য, দেহঘটিত যাহা কিছু, যাহা নিতান্তই প্রাণের প্রবৃত্তি, তাহা আদিম মনোবৃত্তির লক্ষণ, অথবা অমার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমানসে, দেহবাদ বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায়, তাহা কখনও স্থান পায় নাই। তিনি একরূপ দেহবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু সে দেহবাদ ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব নহে, তাহা হইলে ট্র্যাজেডিই তাঁহার কবিচিত্তের প্রধান প্রেরণা হইতে পারিত না। দেহকে বা দেহজীবনকে তিনি এত ছোট করিয়া দেখেন নাই। তিনি যে নিয়তির অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তাহা সৃষ্টির সেই বিরাট রহস্য, সেই রহস্য ভেদ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি, মনীষী, নীতিবিদ্‌ ও ধর্ম্মপ্রণেতা। সম্প্রতি এক নবীনা বিদূষী একখানি কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং দেহবাদের উপরে খড়্গাহস্ত হইলেও সে সম্বন্ধে নানা তত্ত্বকথা নানা স্থান হইতে উদ্ধৃত করিবার সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারই একটি উদ্ধৃত বচনের মধ্যে, আমি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার এই আলোচনার মূল মর্ম্মটির প্রতিধ্বনি পাইয়াছি। বচনটি এই—"As soon as the spirit knows of nothing else but its instincts, the essential wisdom of amorous folly and great love will be revealed to it"। ইহা যে কত বড় সত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রেরণাও যেমন তাহার সাক্ষী, তেমনই ইহা যে সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের মনীষিগণের চিত্তে সমভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকে, এই উক্তিটির মধ্যে তাহারও প্রমাণ মিলিবে। এখানে যাহাকে 'instincts' বলা হইয়াছে তাহাই বিশুদ্ধ দেহধর্ম্ম—ইহারই প্রবুদ্ধ অবস্থায় মানুষ মহাপ্রেমরূপ মহাজ্ঞানের অধিকারী হয়। আমিও ইহার সহিত আর একটি বিদেশী কবির কবিবচন যুক্ত করিব —এ বচন পূর্ব্বটির মত কোন জার্ম্মান কবির নয়, একজন আধুনিক

ইংরেজ কবির, তথাপি আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এই কবিও বলিতেছেন—

Here in the flesh, within the flesh, behind,
Swift in the blood and throbbing on the bone,
Beauty herself, the universal mind,
Eternal April wandering alone ;
The God, the holy Ghost, the atoning Lord,
Here in the flesh, the never yet explored.

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিজীবন সম্বন্ধে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

"যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয়, ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল, যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল, যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল, না হয় খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়।"

ভ্রম-সংশোধন—গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'শনিবারের চিঠি'র 'বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন' প্রবন্ধের ১৭২ পৃষ্ঠার ৯ পংক্তির "মার্চ"-এর স্থলে "এপ্রিল" হইবে।

বঙ্কিমের মৃত্যু

বঙ্কিমের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে সাধারণের মনে ভুল ধারণা আছে। তাঁহাব মৃত্যুর তারিখ প্রকৃতপক্ষে ৮ই জুন, ১৯৩৮ সাল। এতদিন তিনি সরকারি চাকুরি হইতে অবসর লইয়া পেন্‌শন ভোগ করিতেছিলেন, এবং কলিকাতারই এক কোণে নিরিবিলি বাস করিতেছিলেন। শেষ-দিকটা তিনি সংসার একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জপ ধ্যান লইয়াই অহর্নিশি অতিবাহিত করিতেন। বহির্জগতের কোন সংবাদই রাখিতেন না, এমন কি, সাহিত্যেরও কোন সংবাদ তাঁহার কানে পৌছিত না।

৮ই জুন, ১৯৩৮ সাল। বিশ্বপিতার নিকট হইতে ডাক আসিয়াছে, কিন্তু সে ডাক আসিয়াছে ভায়া দার্জিলিং। বঙ্কিমের এক অন্তরঙ্গ সহসাধক দার্জিলিঙে বাস করেন এবং তুষারমৌলিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার অন্তরের ব্যাকুল সাধনা বিশ্বপিতার শ্রীচরণে পৌছাইয়া দেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া একবার বঙ্কিমকে দেখিতে চাহিয়াছেন—তাহারই আকুল আহ্বানে বঙ্কিম দার্জিলিং চলিয়াছেন। বার্থ রিজার্ভ করেন নাই, মনে করিয়াছিলেন, এ সময়ে ভিড় হইবে না। কিন্তু পৌনে নয়টার সময়ে প্ল্যাটফর্মে পৌছিয়া দেখ্লেন, সমস্ত কামরাগুলিতেই লেবেল লাগানো এবং লেবেলগুলি সব ভর্তি। অবশেষে একখানি মাত্র কামরা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে লেবেল ছিল না, কিন্তু দুইজন যাত্রী ছিল, একটি প্রৌঢ় আর একটি সম্ভবত যুবতী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানেই উঠিতে হইল, এবং কুলির পয়সা মিটাইয়া দিতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং মহিলাটির মধ্যে যে কোন পারিবারিক সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে হইল না, অথচ বঙ্কিম লক্ষ্য করিলেন যে, ওপাশের জানালার পাশেব বার্থটি খালি সত্ত্বেও ভদ্রলোকটি কামরার মাঝখানের অপেক্ষাকৃত অপরিসর বার্থটিই অধিকার করিয়া আছেন। যাহা হউক, বঙ্কিম ওদিককাব খালি বার্থটিতেই নিজের বিছানা করিয়া লইলেন

মহিলাটি আধুনিক ফ্যাশনের একখানি শাড়ি আধুনিক ধরণে পরিয়াছেন, ব্লাউজের হাতায় ও গলায় আধুনিক উদারতা বিরাজ করিতেছে, চোখে রিম্‌লেস বাইফোকাল চশমা পরিয়াছেন, দেওয়ালের গায়ে যথাস্থানে হাণ্ড্‌ব্যাগ ও বেঁটে ছাতা ঝুলিতেছে, একজোড়া হাই-হীল আধুনিক জুতা বেঞ্চের নীচে বিরহ-ব্যথা ভোগ করিতেছে। প্রৌঢটির বেশ গোলগাল চেহারা, জমিদারসুলভ পারিপাট্য একটা হাঁদা-হাঁদা ভাবের সহিত মিশিয়া আছে।

ভদ্রলোকটি প্রথম কথা বলিলেন, মশায় কতদূর যাবেন?

একটি নর এবং একটি নারীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি-রূপে আবির্ভূত হইয়া বঙ্কিম নিজেকে একটু অপরাধী মনে করিতেছিলেন, বৃদ্ধ হইলেও সাহিত্যিক তো। একটু যেন সঙ্কোচের সঙ্গেই বলিলেন, দার্জিলিং। আপনারা?

আমরাও।

আমরাও। তাহা হইলে ভদ্রলোকটি এবং মহিলাটি যে দ্বিবচন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্কিম গম্ভীর হইয়া টাইম-টেব্‌লে মন দিলেন। গাড়ি পঞ্চাশ মাইল বেগে একটি স্টেশন পার হইবার সময়ে যখন লাইন বদল করিতেছিল, তখন চট-চটাং-চট শব্দের সঙ্গে সমস্ত গাড়িখানিতে একটি বিষম ঝাঁকানি লাগিল। মহিলাটি হঠাৎ

বেঞ্চের উপর উঠিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওই ফিশ-প্লেট।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, ও কিছু না, গাড়ি লাইন বদল করছে।

তা হোক গে, আমার ভয করছে, আমি আব শোব না।

সারাবাত জেগে ব'সে থাকবে?

হ্যাঁ।

বঙ্কিমও যে খুব নিদ্রাভিভূত হইযাছিলেন, তাহা নহে। তিনি বলিলেন, ভয কি মা, শুযে পড।

না।

নাই যদি শোও, তবে একটু গল্প-সল্প করা যাক। তোমাদেব পবিচয়টা তো পেলুম না।

পবিচয় আর কি বা দেব। সংক্ষেপে বলি, আমবা বঙ্কিমের বোহিণী আর গোবিন্দলাল।

বটে।

বঙ্কিম বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে বেঞ্চির উপব উঠিয়া বসিলেন, এবং চশমার খাপ হইতে শ্যাময় চামডাব টুকবা দিয়া মোটা চশমাটা পরিষ্কার করিয়া একটু সামনে ঝুঁকিযা ভাল কবিযা দেখিয়া ভাবিলেন, তাই তো! বুড়ো হয়েছি কিনা, ভাল ঠাহব করতে পারি নি। মনে মনে সেই পুকুরঘাটের বোহিণীব মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভাবিলেন, রোহিণী! এই কি তুমি সেই রোহিণী বিবহিণী!

গোবিন্দলাল ইতিমধ্যে উঠিয়া বসিয়াছেন। বঙ্কিমের পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহার বা রোহিণীর কাহাবও কৌতূহল দেখা গেল না। বঙ্কিম মনে মনে হাঁফ ছাড়িলেন। বলিলেন, রোহিণীকে তো গোবিন্দলাল (অর্থাৎ আপনি) চিত্রার ধারে বাঁধাঘাটে গুলি ক'বে মেরে ফেলেছিল।

রো। বঙ্কিমের সেই ধারণা হয়েছিল, লোকেও তাই জানে।

ব। তা হ'লে তুমি মর নি—এ যে দেখছি দ্বিতীয় ভাওয়াল!

রো। আজ্ঞে না, মরি নি।

ব। তোমার বয়স তা হ'লে—

রো। মহিলাদের বয়স থাকে না, এবং সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষে শোভনীয় নয়।

ব। তুমি কিছু মনে ক'র না—আমি নির্লিপ্ত ঐতিহাসিকভাবেই প্রশ্ন করেছি। সে কথা যাক। তুমি কি ক'রে বাঁচলে আমার ভারি শুনতে ইচ্ছে করছে। তোমার এই বিচিত্র কাহিনী শোনার জন্যই বুঝি এ বয়সেও বেঁচে আছি—আর আজ দার্জিলিং মেলে এই যোগাযোগ ঘটেছে।

রো। গোবিন্দর গুলিটা আমার বুকের বাঁ দিকে লাগে, তাতে পাঁজরার একখানা হাড় ভেঙে যায়, আর কোন ক্ষতি হয় নি। জ্ঞান হয়ে দেখি চিত্রার ধারের এক গ্রামে আমাকে নিয়ে গিয়েছে—ওখানকার গার্ল-গাইডের মেয়েরা। প্রাথমিক চিকিৎসা হ'ল—টিংচার আইডিন দিয়ে। কিন্তু তাতে আমার ভরসা হ'ল না। অনেক চেষ্টা ক'রে গায়ের একখানা গহনা বেচে কলকাতায় চ'লে এলুম। কোনদিন কলকাতা দেখি নি—চারিদিকে সব দেখে শুনে তাক লেগে গেল। অনেককে জিজ্ঞাসা করলুম, অনেক পরামর্শ নিলুম, সবাই বললে, এসব কেসে রবীন ডাক্তারই ভাল। ফী একটু বেশি, কিন্তু অবস্থা বুঝিয়ে বললে ফী নাও নিতে পারেন। ডাক্তার রবীন্দ্র এলেন, চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। সমস্ত অবস্থা শুনে রুমালে একবার চোখ মুছলেন। তাঁর ওষুধে খুব কাজ হ'ল। তারপর এক দূর-সম্পর্কীয় দাদা আমার অসুখের সংবাদ পেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তিনি বাসায়ই

থেকে গেলেন। বললাম, শরৎদা, বাঁচব তো? তিনি দরদ-মাখানো ভাষায় বললেন, নিশ্চয়ই। তাবপব আর কি? বুঝতেই পাবছেন। ডাক্তারের বিশ্বঘাঁটা ওষুধে আব মবমী শবৎদার 'আপ্রাণ' সেবায় আমাব জীবন ফিবে পেলুম। ছুটে গেলুম কোর্টে, গোবিন্দব বিরুদ্ধে মামলা নাকচ ক'বে দিলুম। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গোবিন্দকে খুঁজে বের কবলুম। তাবপব আজ ওয়াল্‌টেয়াব, কাল গিবিডি, পবশু দার্জিলিং, এই করছি।

বঙ্কিম মনে মনে ভাবিলেন, কি ঝকমাবি কবেছি, কৃষ্ণকান্তেব উইল লিখে! কপিবাইটও ছাই নেই যে, প্রকাশ বন্ধ ক'বে দেব। বলিলেন, তা বেশ, কিন্তু মাথায় সিঁদুব নেই কেন মা?

বো। আমাদেব তো বিয়ে হয় নি।

ব। কেন?

বো। ভ্রমব মত দেয় না। কত ক'বে বোঝালুম, কত দৃষ্টান্ত দিলুম, রাজা দশবথ, অবতার শ্রীকৃষ্ণ, ও একগুঁয়ে মেয়ে কিছুতেই রাজি হয় না।

ব। কিন্তু ভ্রমবের মতেব দবকাবই বা কি?

রো। সে বলে, বিয়ে হ'লে সে আত্মহত্যা কববে। যে একগুঁয়ে মেয়ে, তার অসাধ্য কিছু নেই। সে আশা ক'বে ব'সে আছে, গোবিন্দব মন একদিন ফিববেই। বিয়ে হ'লে তো আব সে পথ থাকবে না। তা ছাড়া সম্পত্তির ব্যাপাবও তো আছে।

ব। আত্মহত্যা যদি সে করেই, তাতে তোমার কি এসে যায়?

রো। অতটা সইতে পারব না, মাফ কববেন সর্।

ব। ভ্রমর এখন কোথায়—গাঁয়েই থাকে বুঝি?

রো। মোটেই না। সে ভ্রমর আর নেই, যাকে দেখে মানকুমাবীদি

বলেছিলেন, হায় অভাগী ভ্রমর! সে এখন থাকে বালীগঞ্জে, ম্যানেজার মাসে মাসে টাকা পাঠায়, বিকেলে ওদিকে গেলেই দেখতে পাবেন, একখানা ব্লু-ব্ল্যাক ক্রাইস্‌লারে চ'ড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। অহোরাত্র দান-ধ্যান, পূজা-অর্চনা আর গোটা দশেক সেবা-সমিতি এই নিয়ে মেতে আছে। সাহিত্যিকদের ওপরে ভারি চটা। দরোয়ানের ওপর কড়া হুকুম, কেউ যেন গেটের ভেতরে না ঢোকে।

বঙ্কিম ভাবিলেন, যাক, আমার ভ্রমর তার গোঁ বজায় রেখেছে, মা ভ্রমর আমার জন্ম জন্ম বেঁচে থাক। পাড়াগেঁয়ে অভিমান—দড়ি-কলসী—ছেড়ে, শহুরে অভিমান—ক্রাইস্‌লার—ধরেছে, এই যা। তা ধরুক। মা লক্ষ্মী বেঁচে তো আছে। বঙ্কিম বলিলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে আমি এসে প'ড়ে দ্বাভ্যাং তৃতীয় হয়ে পড়েছি, না?

রো। তিনজন আর কই, গোবিন্দ তো দেখছি ঘুমিয়ে পড়েছে—আহা বেচারা! তা ছাড়া এই তৃতীয়ই তো জীবনের সার। জীবনেই বলুন আর সাহিত্যেই বলুন, এই তৃতীয়ই তো সর্বস্ব। যে কোন আর্ট, যে কোন রসসৃষ্টি—তার মূলে এই তৃতীয়। রামসীতার জীবনে তৃতীয় ব্যক্তি রাবণের আবির্ভাব না ঘটলে, রামের পিতৃভক্তি, সীতার পতিভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি—কিছুই রামায়ণটাকে বাজারে চালাতে পারত না। আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে, এই নিরিবিলি ট্রেনের কামরায় আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি।

বঙ্কিমের জপধ্যানসাধনাসিদ্ধ শরীরে ও মনে একটা বিষম জ্বালা উপস্থিত হইল। মাথার মধ্যে যেন কেহ সবলে সূচ ফুটাইয়া দিল। তিনি ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রোহিণী বলিল, আপনাকে যেন একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ আপনাকে বকিয়েছি। তারপর একটি গোল্ড-ফ্লেক সিগারেটের টিন

বাহির করিয়া একটি সিগারেট নিজে ধরাইল এবং আর একটি বঙ্কিমের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, আস্থন সর্‌—মাথাটা ভাল বোধ করবেন।

বঙ্কিম হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, আর না—মানুষের আয়ুরও সীমা থাকা উচিত। তাবপব সহসা একটি দরজা খুলিযা বোহিণীব দিকে একবাব চাহিয়া বলিলেন, আমি বঙ্কিম।—বলিয়াই চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইযা পডিলেন। ট্রেন তখন সারা ব্রিজের উপর আসিযা পডিযাছে—পদ্মাদেবী সাদবে বঙ্কিমকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

ইহাই বঙ্কিমের মৃত্যুব প্রকৃত ইতিহাস।

"ভাস্কব"

"তখনই স্বর্গে গেলাম—'অশ্বমনোরথে।' স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।'

দেবেন্দ্র বলিলেন, 'আপত্তি কি—পুরস্কাব চাই কি?'

আমি। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে তাহা ত মর্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক,—আটটার হিসাবে।

আমি দুর্ম্মুখ—বলিলাম 'কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজ কাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।'

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্‌শিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—'নেশাখোর!' 'বিটলে!' 'পেটার্থি!' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, 'বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।'"

বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মজীবন

বঙ্কিমচন্দ্র কত দিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কখন কোথায় কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন জীবনীতে পাইবার উপায় নাই, অথচ বঙ্কিমের জীবনচরিত-রচনায় এরূপ একটি তালিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

সুখের বিষয়, এরূপ একটি তালিকা সঙ্কলন করা দুরূহ নহে। এই কার্য্যের জন্য দুইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি, পুরাতন 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণরের রাজকর্ম্মচারী-নিয়োগাদির আদেশগুলি। দ্বিতীয়টি, অ্যাকাউনটেণ্ট-জেনারেলের আপিস হইতে সঙ্কলিত *History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal.* এই ইতিহাসের ১৮৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১ সনের তিনটি খণ্ড দেখিয়াছি। এই তিনটি খণ্ডে প্রদত্ত তারিখগুলি সর্ব্বত্র একরূপ নহে। কিন্তু ১৮৯১ সনের (এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন) খণ্ডটি "Corrected to 1st July 1891" বলিয়া আমরা এই খণ্ডটিকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিতে পারি।

এই দুইটি উপাদানের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্য্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী হিসাব-বিভাগের তারিখের সহিত 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত নিয়োগাদির তারিখের সর্ব্বত্র মিল নাই, যে-যে স্থলে ব্যতিক্রম আছে পাদটীকায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। নিয়োগের তারিখ ও কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মভারগ্রহণের তারিখের মধ্যে সে-সময়ে

সচরাচর পনর-ষোল দিনের ব্যবধান থাকিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ২১ জানুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর পদে নিযুক্ত হইলেও কর্ম্মভার গ্রহণ করেন পরবর্ত্তী ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে।

শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস ও মেদিনীপুরের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বিনয়রঞ্জন সেন এই তালিকা-সঙ্কলন ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সেন-মহাশয় মেদিনীপুর কলেক্টরীর দপ্তরখানা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি পত্রও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
যশোহর	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৫৮, ৭ আগষ্ট[১]
নেগুয়াঁ (মেদিনীপুর)	ঐ	১৮৬০, ২১ জানুয়ারি[২]
	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১৮৬০, ৭ নবেম্বর

১ বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণর কর্ত্তৃক নিয়োগের তারিখ ৬ আগষ্ট ১৮৫৮।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ আগষ্ট ১৮৫৮।

২ বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি পত্রে প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০ তারিখে তিনি নেগুয়াঁ পৌঁছান এবং পরবর্ত্তী ৯ই তারিখে তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
খুলনা	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৬০, ৯ নবেম্বর[৩]
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন		
	ঐ	১৮৬১, ৫ অক্টোবর
	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি
বারুইপুর (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৬৪, ৫ মার্চ[৪]
	ঐ (অস্থায়ী)—ডায়মণ্ড হারবার	১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর
	ঐ (৩য় শ্রেণী)	১৮৬৬, ৫ মার্চ
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন		
	ঐ	১৮৬৬, ৭ আগষ্ট
গবর্মেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্দ্ধারণ জন্য কমিশনের কাজ		১৮৬৭, ৩১ মে[৫]
	ঐ (অস্থায়ী)—আলিপুর, ২৪-পরগণা	১৮৬৭, ১৪ আগষ্ট
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস		
	ঐ	১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর

৩ "The 9th November 1860.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, B. A., Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Khoolnah, and to exercise the full powers of a Magistrate in Jessore."—*The Calcutta Gazette*, 17 Nov. 1860.

৪ "The 5th March 1864.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Barripore, and to exercise the full powers of a Magistrate in the 24-Pergunnahs."—*The Calcutta Gazette*, 9 March 1864.

৫ 'ক্যালকাটা গেজেট,' ৫ জুন ১৮৬৭ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ১৮৮৯ সনের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসে তারিখটি ২ জুন ১৮৬৭ আছে।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
মুর্শিদাবাদ	ডে. ম্যা. ও ডে. ক.	১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর[৬]
	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৮৭০, ২৫ নবেম্বর
	বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্‌টাণ্ট (অস্থায়ী)	১৮৭১, ২৫ এপ্রিল[৭]
	ঐ	১৮৭১, ২৮ মে
	মুর্শিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি	১৮৭১, ১০ জুন[৮]
	ছুটি : বিনা-মঞ্জুরীতে দুই দিন—১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল ১৮৭৩	
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস	
বারাসত (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৭৪, ৪ মে*
	মালদহে রোড-সেস বা পথকর-কার্য্যে (অস্থায়ী)	১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর[৯]
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন	
হুগলী	ঐ	১৮৭৬, ২০ মার্চ[১০]
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দিন	
	ঐ	১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি
	ঐ এবং বর্দ্ধমান-ডিবিসন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট	১৮৮০, ৬ নবেম্বর
হাবড়া	ঐ ঐ	১৮৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারি[১১]

৬ ২৯ নবেম্বর ১৮৬৯।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১ ডিসেম্বর ১৮৬৯।

৭ ১৫ এপ্রিল ১৮৭১।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৯ এপ্রিল ১৮৭১।

৮ 'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৪ জুন ১৮৭১।

* ২৮ এপ্রিল ১৮৭৪।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২৯ এপ্রিল ১৮৭৪।

৯ ১৮৮৯ সনের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসের মতে ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।

১০ ১৩ মার্চ ১৮৭৬।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৫ মার্চ ১৮৭৬।

১১ ৬ জানুয়ারি ১৮৮১।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১২ জানুয়ারি ১৮৮১।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
কলিকাতা	বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী (অস্থায়ী)	১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর[১২]
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ডে. ম্যা. ও ডে. ক. ২য় শ্রেণী (অস্থায়ী)	১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি[১৩]
বারাসাত	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৪ মে[১৪]
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ১৭ মে
জাজপুর (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৮ আগষ্ট[১৫]
হাবড়া	ঐ	১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি[১৬]

ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ্ ২০ নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন[১৭]

	ঐ (১ম শ্রেণী)	১৮৮৪, ১ নবেম্বর[১৮]

---

১২ ১৬ আগষ্ট ১৮৮১।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৭ আগষ্ট ১৮৮১।

১৩ ২৩ জানুয়ারি ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২৫ জানুয়ারি ১৮৮২।

১৪ ২৯ এপ্রিল ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ৩ মে ১৮৮২।

১৫ ২৬ জুলাই ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২ আগষ্ট ১৮৮২।

১৬ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

১৭ ১৮৯০ সনের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস।

১৮ ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৪।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৪।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
ঝিনাইদহ (যশোহর)	ডে. ম্যা. ও ডে. ক.	১৮৮৫, ১ জুলাই
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস		
ভদ্রক (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮৬, ১৭ মে[১৯]
হাবড়া	ঐ	১৮৮৬, ১০ জুলাই[২০]
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস		
মেদিনীপুর	ঐ	১৮৮৭, ১৯ মে[২১]
ছুটি বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন		
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল[২২]
ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯০ হইতে ১ মাস ১৭ দিন		

অবসরগ্রহণ—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

১৯ ১২ মে ১৮৮৬।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৯ মে ১৮৮৬। বালেশ্বরের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন, "...from the old correspondence of the year 1886, it appears that Babu Bankim Chandra Chatterjee, Dy Mag. and Dy. Collr held charge of the Bhadrak subdivision temporarily from the 17th May to the 26th June 1886—for a period of 41 days only."

২০ ৫ জুন ১৮৮৬।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ৯ জুন ১৮৮৬।

২১ ১০ মে ১৮৮৭।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ মে ১৮৮৭।

২২ ১০ এপ্রিল ১৮৮৮।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ এপ্রিল ১৮৮৮।

বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়

বহু মাস, বহু বৎসব পূর্ব্বে সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা সফল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বাঙালীকে যে ধ্যানলব্ধ 'বন্দে মাতবম্' মন্ত্র শুনাইযা গিযাছিলেন, আজ আবার সেই মন্ত্রে নূতন দীক্ষা লাভ কবিযা বাঙালী নবজীবনেব পথে ছুটিযা চলিযাছে। তাঁহাব জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সম্বোধন কবিযা তিনি বলিযাছিলেন, "একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসব পবে একদিন দেখিবে, এই গান লইযা বাঙ্গালা উন্মত্ত হইযাছে—বাঙ্গালী মাতিযাছে।"[১] আজ শুধু বাংলা নয, সমস্ত ভাবতবর্ষ সেই গানে মাতিযা উঠিযাছে। আজ পৃথিবীব দূবতম প্রান্তেও সেই গানেব রুদ্রমধুব ঝঙ্কাব শোনা যাইতেছে। শুধু এক দল ক্ষুব্ধ মুসলমান তাঁহাদেব অসঙ্গত অভিমান লইযা আজও দূবে দাঁড়াইযা আছেন, যে গানে ভাবতবর্ষেব প্রাণ জাগিযাছে, যে গানে ভাষাহীন মূক ভাবতবর্ষ বহুদিনকাব হারানো ভাষা খুঁজিযা পাইযাছে, সে গানে ভাবতবাসী হইযাও যোগ দেন নাই।

ভাবতীয মুসলমানদের মধ্যে এক সম্প্রদায আছেন, যাঁহারা বঙ্কিম সম্বন্ধে মনে ও মুখে গভীব আক্রোশ পোষণ কবেন। 'বন্দে মাতরমে'র ঋষিকে তাঁহারা হীন সাম্প্রদাযিকতাব অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া থাকেন। হয়তো অনেক হিন্দুবও তাই ধাবণা, আব আপাতদৃষ্টিতে এ ধাবণা বোধ হয় বিশেষ অসঙ্গতও নয। 'বাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' পড়িলে মনে প্রথমটা এই ধাবণাই জাগে। কিন্তু বঙ্কিমেব সমস্ত রচনাবলীর যথাযথ আলোচনা কবিলে দেখা যাইবে যে, আপত্তিকারী মুসলমান

---

১ **বঙ্কিম-জীবনী**—শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভ্রাতৃগণের এ ধারণা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। পলাশী-ক্ষেত্রের নাম শুনিলে যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তিনি কখনও মুসলমানদ্বেষী হইতে পারেন না, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাঁহার মন কখনও আবদ্ধ থাকিতে পারে না। উপন্যাসের মধ্যে লেখকের মনোভাব সব সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপন্যাসের চরিত্রগুলি সাধারণত কাল্পনিক হয়, এবং তাহাদের কথাবার্ত্তাও হয় নাটকীয়ভাবে রচিত। তাহার মধ্যে কোন্‌টা যে লেখকের যথার্থ অভিমত এবং কোন্‌টা নয়, তাহা স্থির করা প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং যদি শুধু 'রাজসিংহ' এবং 'আনন্দমঠে'র উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িকতার অপবাদে অপরাধী করা হয়, তবে বোধ হয় তাঁহার প্রতি খুব সুবিচার করা হইবে না। এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বঙ্কিমের উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য যে সব রচনা আছে, তাহারই আলোচনা করা দরকার।

বঙ্কিম যেমন ঔপন্যাসিক ছিলেন, তেমনই তিনি ছিলেন দার্শনিক। এক দিকে মিল বেন্থাম প্রভৃতির হিতবাদ ও অন্য দিকে গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি এক বিরাট দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত ধর্ম্ম ও দার্শনিক তথ্যের সার-স্বরূপ ছিল তাঁহার স্বদেশপ্রেম—শ্রীঅরবিন্দ কথিত 'religion of patriotism' ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় 'রিলিজন'। এই স্বদেশপ্রেমের বিশেষত্ব এই যে, মস্ত বড় একটা দার্শনিক ভিত্তির উপর ছিল এর প্রতিষ্ঠা। তিনি দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত পার্থিব প্রীতির মধ্যে দেশপ্রীতির স্থানই সর্ব্বোচ্চে, এমন কি আত্মপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি অপেক্ষাও ইহা বড়। কারণ দেশ বলিতে আমরা বহু লোকের সমষ্টি বুঝি। এই সমষ্টির অধঃপতনে ব্যষ্টির পতন এবং সমষ্টির উন্নতিতে ব্যষ্টির উন্নতি ঘটে। তাই ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে দেশের পার্থিব ও

আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানব-জীবনের প্রধান-তম লক্ষ্য অবশ্য ঈশ্বরপ্রীতি, কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে দেশপ্রীতির প্রয়োজনীয়তাও কোন অংশে কম নয়। এই দেশপ্রীতি আবার ইউরোপীয 'patriotism' নয়, স্বদেশের হিতসাধন করিয়াই ইহা সন্তুষ্ট, পরের সমাজের ধন কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনে না।[২] বঙ্কিমের সমস্ত সমাজ ও স্বদেশ বিষয়ক বচনার ইহাই সাব কথা, এবং ইহাব দ্বারাই তাঁহার সমস্ত বচনাব বিচাব করিতে হইবে।

এই স্বদেশপ্রীতিব পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে সুজলা সুফলা বাংলা দেশকে ঘিরিযা। এই বাংলার ইতিহাস নাই বলিযা তাঁহাব ক্ষোভের ও দুঃখের সীমা ছিল না। এই বাংলার অতীতেব কথা ভাবিয়া তাঁহাব প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। আবাব এই বাংলার ভবিষ্যতেব কথা ভাবিযা তিনি দৃঢ় হস্তে অমোঘ লেখনী ধাবণ কবিযাছিলেন। কিন্তু তিনি কি শুধু বাঙালী হিন্দুকেই ভালবাসিতেন? তিনি কি জানিতেন না যে, এই মহামিলনের সাগবতীবে বহু বিভিন্ন জীবনধাবা আসিযা এক বৃহত্তব অস্তিত্বেব স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে? বাংলাব এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া তিনি কি তাঁহাব সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্বের অহঙ্কাব লইযা দূবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মহামানবতার মন্দিবে মৈত্রীর অর্ঘ্য দেন নাই? তিনিও দিযাছিলেন প্রীতি ও মৈত্রীর উপহাব। তাই তো তিনি ইতিহাসের ছিন্নপত্র হইতে কযেকটি কলঙ্কময় অধ্যাযের বিলোপসাধন করিয়া বাংলার লুপ্ত গৌববের পুনরুদ্ধারের প্রযাস পাইযাছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের ঘটনা মিথ্যা।[৩] তিনি বলিয়াছিলেন যে, পলাশী ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সেনার কাপুরুষতার অপবাদ মিথ্যা।[৪] আর

২ অনুশীলন, চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়—স্বদেশপ্রীতি।

৩ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালার ইতিহাস।

৪ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বলিয়াছিলেন যে, হৃতশক্তি স্থবির নবাব মীরজাফরের ছিল না শাসন করার ক্ষমতা, ছিল শোষণ করার প্রলোভন।[৫] কিন্তু ইহা দ্বারা মুসলমান-সাধারণের উপর কোন বিদ্বেষ প্রকাশ পায় না। তাঁহার বিদ্বেষ ছিল শুধু বাংলার শত্রুদের উপর। যে বাংলার শত্রু, সে তাঁহারও শত্রু, তা সে হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক। কারণ বাংলা তাঁহার প্রিয়, প্রাণাধিক প্রিয় জন্মভূমি, কারণ বাংলার পূজা, বাংলার কল্যাণই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আচরণীয় নীতি। এই নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি বাংলার শত্রুদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আবার এই নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি বাংলার মিত্রদের প্রশংসাগান করিতে ভোলেন নাই। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত বাংলার ইতিহাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে[৬] তিনি যে সাম্প্রদায়িক ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন যে, স্বাধীন পাঠানদের রাজত্বকালে বাংলার দুর্দ্দশা ঘটে নাই। "রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না"—এই কথাটি তাঁহার গভীর জ্ঞান ও ঐতিহাসিক দূরদর্শিতার ফল, এবং তিনি যে মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন না, এই কথাটাই তাহার শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। তারপর তিনি আবার বলিতেছেন, "পরাধীনতার একটা প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্ত্তি নিভিয়া যায়। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।"[৭] বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আবির্ভাব সেই যুগে, রঘুনাথ রঘুনন্দন সেই যুগের লোক, শুধু তাই নয়, বাংলার প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যই পাঠান-যুগে লিখিত। অতএব দেখা যাইতেছে,

৫ আনন্দমঠ, ১ম খণ্ড—৭ম পরিচ্ছেদ।

৬ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালার ইতিহাস।

৭ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালার ইতিহাস।

পাঠান-যুগকে বাংলার অধীনতার যুগ কোন মতেই বলা চলে না, এবং পাঠানেরাও বাংলার শত্রু নহে। আধুনিক কালে আমরা বঙ্কিমের এই কথাটি আবও গভীবভাবে উপলব্ধি করিযাছি। আমবা দেখিয়াছি, সে যুগেব মুসলমান নবাবেবা বাংলা সাহিত্যের অনুবাগী ছিলেন। অনেকে সাহিত্যিকদেব পৃষ্ঠপোষকতা কবিতেন। হুসেন শাহেব কথা কাহারও অবিদিত নয়। কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক বামাযণ অনুবাদেব ইতিহাস আমবা জানি। অনেক মুসলমান বাংলা সাহিত্য বচনা কবিতেন, অনেকে হিন্দু দেবদেবীব কাহিনী লইযা সাহিত্যসৃষ্টি কবিতেন, এমন কি অনেক মুসলমান বৈষ্ণব-কবিতা পর্য্যন্ত লিখিযা গিয়াছেন। সে যুগে বিজেতা এবং বিজিতেব মধ্যে একটা ভাবগত এবং সংস্কৃতিগত যোগসূত্র স্থাপিত হইযাছিল। বিদেশী পাঠান বাংলায আসিযা বাংলাকে, বাংলাব সাহিত্যকে, এমন কি অনেকাংশে বাংলাব সংস্কৃতিকেও আপনাব বলিযা ভাবিতে আবম্ভ কবিযাছিল। বঙ্কিম তাই বলিযাছেন যে, পাঠানেবা বাংলার শত্রু নহে। তবে শত্রু কে? শত্রু মোগলেবা, কাবণ তাহারা বাংলাব সমস্ত ধনসম্পদ লুণ্ঠন কবিযা দিল্লীতে বসিযা মহাসমাবোহে বাদশাহগিবি করিযাছে, দুঃখিনী বাংলাব পানে একবাব ফিবিযাও চাহে নাই। তাই বঙ্কিমেব বোষ গিযা পডিযাছে মোগলেব উপব। তাঁহার মতে আকবব বাদশাহই বাংলার সবচেয়ে বড শত্রু। "তিনিই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালীকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালাব শ্রীহানি আরম্ভ। মোগল পাঠানেব মধ্যে আমবা মোগলেব অধিক সম্পদ দেখিয়া জয় গাহিয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদেব শত্রু, পাঠান আমাদেব মিত্র। মোগলেব অধিকাবেব পব হইতে ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যেদিন হইতে দিল্লীর মোগলেব সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুববস্থাপ্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার

ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না; দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নিম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য। তক্ত-তাউসের কথা পড়িয়া মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে?...বাঙ্গালায় হিন্দুব অনেক কীর্ত্তিব চিহ্ন আছে, পাঠানেব অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসব মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলেব কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে?"[৮] অন্যত্র আবার তিনি খেদ করিয়া বলিতেছেন, "মোগলজয়েব পর বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল, বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন দেশ না থাকিয়া পরাধীন বিভাগ মাত্র হইয়াছিল।"[৯]

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বঙ্কিমেব মতে পাঠান শাসন বাংলার পক্ষে পবাধীনতা নয়। দেশেব অর্থ যদি দেশে থাকে এবং রাজার শাসনে যদি রাজ্যের কল্যাণ হয়, তবে রাজা বিদেশী হওয়াতে কোন ক্ষতিই হইতে পারে না। আসল কথা, শাসন ও শাসিতের মধ্যে একটা আন্তরিক যোগসূত্র চাই, নতুবা দেশের কল্যাণ হইবে না, আর যদি দেশের মঙ্গল না হইযা অমঙ্গল হয়, তবে সিংহাসনে দেশী রাজাই বসুন আর বিদেশী রাজাই বসুন—কিছুই আসিয়া যায না। দেশী ও বিদেশী উভয়েই সমান নিন্দনীয হইয়া পডে। বঙ্কিম যে শুধু মোগলদের দোষ দিয়াছেন তাহা নহে, হিন্দু রাজারাও যে অনেক পরিমাণে দেশের ক্ষতি করিয়াছেন, এ কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি

---

৮ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালার ইতিহাস।

৯ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বলিয়াছেন যে, হিন্দুর রাজত্বকালে জাতীয় একতার একান্ত অভাব ছিল, হিন্দুদের শাসন-প্রণালীতে এই জিনিসটা চিরদিনই উপেক্ষিত।[১০] ইংরেজ আমাদের এই জিনিসের সন্ধান দিয়াছে, তাই তিনি ইংরেজের অনুরাগী। 'আনন্দমঠে' তিনি মুসলমানদেব হেয় প্রতিপন্ন কবিবাব চেষ্টা করেন নাই, মুসলমান-শাসনেব কোন এক কলঙ্কময অধ্যাযের পটভূমিকায এই গভীর সত্যটি প্রচাব কবিযাছেন। মুসলমান বলিযা মুসলমানকে তিনি ঘৃণা কবেন নাই, তিনি দেখিতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমানই হউক আর হিন্দুই হউক, সে বাংলাব কল্যাণকামী কি না। মুসলমানকে তিনি হিন্দু হইতে বলেন নাই, বলিযাছেন বাঙালী হইতে, বিশেষ কবিযা সেই মুসলমানদিগকে যাহাবা বাংলাব স্বাধীনতাব মূল্য দিযা ঐশ্বর্য্য কিনিয়াছিল। তাই, যদি মুসলমানদেব সম্পর্কে বঙ্কিমের কোন বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহাও একান্ত অতীতেব প্রতি বিদ্বেষ, বর্ত্তমানেব সহিত তাহাব কোন সম্পর্ক নাই।

এখন দেখিতে হইবে, এ বাংলা কাহার? বঙ্কিমের এই শস্যশ্যামলা মহিমময়ী জননী কি হিন্দুর, না মুসলমানেব মাতা, না উভযের? বঙ্কিম হযতো প্রথমটা বলিতেন, হিন্দুব, কিন্তু যে দেশে পাঁচ শতাধিক বৎসর ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিতেছে, সে দেশ যে শুধু হিন্দুর নয়, এ কথা বঙ্কিম ভাল করিয়াই জানিতেন। মুসলমান প্রথমটা বিজয়ী শাসকরূপে বাংলায় প্রবেশ কবিয়াছিল সত্য, কিন্তু পাঁচ শতাধিক বৎসর পবে তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে বঙ্কিম সন্দেহ প্রকাশ কবিতে চাহেন নাই। "এখন ত দেখিতে পাই বাংলাব অর্দ্ধেক লোক মুসলমান"[১১]—এ কথা যখন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন,

---

১০ বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড—ভারত কলঙ্ক।

১১ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

তখন কি তিনি বাংলাকে শুধু হিন্দুর বাংলারূপে পূজা করিয়াছিলেন? তাহা নহে। যে মাতার তিনি বন্দনা-গান করিয়াছিলেন, তিনি সমানভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতা। "সপ্ত কোটী কণ্ঠ" শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও জয়ধ্বনিতে মুখর। "দ্বিসপ্ত কোটী ভুজ" হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমবেত শক্তিতে উত্তোলিত।

বাঙালী জাতির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাঙালী জাতিকে আর্য্য হিন্দু বলিলে ভুল বলা হইবে। "ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালী বহুজাতি। বাস্তবিক আমরা এক্ষণে যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলি, তাহাদের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান।"[১২] বঙ্কিম যে বঙ্গজননীর মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, এই সুবৃহৎ বাঙালী জাতির মা তিনি, হিন্দুরও নহেন, মুসলমানেরও নহেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, এই বিরাট জাতির মধ্যে ঐক্য ছিল না, ছিল না অন্তরের সামঞ্জস্য। তাই তো বাংলার দুর্দ্দশা কিছুতেই ঘুচিল না। এতদিন ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানে মারামারি কাটাকাটি করিয়াছে, সে কথা এখন ভুলিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় কি! দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিলে মুসলমানকে বাদ দিবার উপায় নাই, বাংলার প্রাঙ্গণে তাহারা অনেকটা স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। তবু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাংলায় এখনও রাষ্ট্রীয় চেতনা আসে নাই, কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য নাই। এক জাতি, এক দেশ, এবং এই দেশের কল্যাণ সবারই লক্ষ্য—এই ভাবটি যেদিন হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সবারই মনে জাগিবে, সেইদিন বাংলার দুঃখ দূর হইবে, ইহাই ছিল বঙ্কিমের অভিমত। ইংরেজ আমাদের মনে এই ভাবটি

১২ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালীর উৎপত্তি, ৭ম পরিচ্ছেদ।

জাগাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাই বঙ্কিম ইংরেজেব শিক্ষাদীক্ষার এত অনুরাগী। তিনি বলিতেছেন, "যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির··· উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি-প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে হিন্দু জানিত না।"[১৩] এই রাষ্ট্রীয় চেতনা লাভ করিয়া হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া সংযুক্ত ও স্বাধীন বাংলা গড়িয়া তুলুক। বাংলা মরিয়া গিয়াছে, মৃত জননীর অতীত লইয়া ইতিহাস রচনা করুক, মৃত জননীকে আবার বাঁচাইয়া তুলুক। "মা যদি মরিয়া যান তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আনন্দ নাই?"[১৪] এই সর্ব্বসাধারণ বলিতে শুধু হিন্দুকে বুঝায় না, বহু জাতির সম্মিলনে গঠিত বিবাট বাঙালী জাতিকে বুঝায়, আর এই বাংলার উপব সকলেরই সমান অধিকার।

বাংলার কৃষকদের সম্বন্ধে বঙ্কিম যে অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহা লইয়া আলোচনা করিলে ব্যাপাবটা আরও একটু স্পষ্ট হইতে পারে। আজ যে প্রজাদের সকরুণ বেদনার কাহিনীতে আমাদের শাসন-পরিষদ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিম বহুদিন পূর্ব্বেই তাহা গভীরভাবে উপলব্ধি কবিযাছিলেন।[১৫] প্রজাদের 'ডাল ভাত' সমস্যা লইয়া তিনিও যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশেব কৃষকদেব সম্বন্ধে তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি খুব সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ। বঙ্কিম সেদিনই বুঝিয়াছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হইয়া প্রজাদের হিতের পরিবর্ত্তে অহিতই হইয়াছে বেশি। তিনি দেখিয়াছিলেন যে,

---

১৩ বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড—ভারত কলঙ্ক।

১৪ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

১৫ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বঙ্গদেশের কৃষক।

ব্রিটিশ-শাসনে দেশের যে শ্রীবৃদ্ধিব কথা শুনা যাইতেছে, তাহাতে দরিদ্র নিঃসম্বল প্রজাদেব কণামাত্র ভাগ নাই। তাহারা যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই। কৃষকেরাই দেশেব মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব। তাহাদেব না আছে স্বাধীনতা, না আছে সম্বল। প্রকৃতি ও জমিদারের অর্থহীন খেয়ালে পড়িয়া তাহাদেব অবস্থা অত্যন্ত করুণ হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিম আবও জানিতেন যে, কৃষকেবা প্রায় সবাই মুসলমান ও আজকালকাব তথাকথিত অনুন্নত-শ্রেণী।[১৬] বাংলার দরিদ্র কৃষকদেব উপব তিনি তাঁহাব আন্তবিক সহানুভূতি অকৃপণ হস্তে ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখানেও তিনি হিন্দু ও মুসলমানে কোন ভেদাভেদ কবেন নাই, যেমন 'পবাণ মণ্ডলে'ব কথা বলিয়াছেন, তেমনই 'হাসিম শেখে'র কথাও উল্লেখ কবিতে ভোলেন নাই। তাঁহাব সহানুভূতির স্পর্শে ইহাদেব জাতিগত অনৈক্য যেন ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া যেন ইহাদিগকে আব চেনা যায় না। ইহাবা যেন দুই ভাই, দুঃখিনী কৃষিলক্ষ্মীর নিঃস্ব সন্তান দুইটি, ঘরে পরে লাঞ্ছিত, প্রকৃতিব খেয়ালে সমানভাবে বিপর্য্যস্ত এবং জমিদার ও মহাজনদেব অত্যাচাবে সমানভাবে প্রপীড়িত। তাই মনে হয়, বঙ্কিম মুসলমানদ্বেষী ছিলেন না, বাঙালীমাত্রকেই তিনি ভালবাসিতেন। মুসলমান বলিয়া দবিদ্র কৃষকদেব তিনি ঘৃণা করেন নাই, বরং তাহাদের দুঃখের কথা সবিস্তাবে লিখিয়া প্রতিকারেব জন্য সবারই কাছে আবেদন করিয়াছেন। ইহা কি বিদ্বেষ? বঙ্কিম যদি মুসলমান-বিদ্বেষী হইতেন, তবে বাংলাব যে মুসলমান-নেতা আজ তাঁহার সবচেয়ে বড় শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারই গৃহীত আদর্শ লইয়া সগর্ব্বে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেন না।

---

১৬ বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড—বঙ্গদেশের কৃষক, ১ম পরিচ্ছেদ।

'আনন্দমঠ' বইখানি লইয়া অনেক আলোচনা, বাদবিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, বইখানি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য অনেকে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, অনেকে আবার bonfire করিয়া ইহার গৌরব অনেক বাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, এখানি উপন্যাস, প্রবন্ধ নহে। তাই, এই বইয়ের মতামতের উপর যদি খুব বেশি নির্ভর করিতে হয়, তবে বঙ্কিমের অন্যান্য মতগুলির সহিত মিলাইয়া দেখা উচিত, এবং চেষ্টা করিলে বোধ হয় দুইয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের পটভূমিকাস্বরূপ বঙ্কিম বাংলার ইতিহাসের সেই অধ্যায়টি গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা দুঃখ ও কলঙ্কের কাহিনীতে ভরা এবং যাহা মুসলমানদেরও অগৌরবের স্থল। মীরজাফরকে নিশ্চয়ই কোন মুসলমান 'brother-in-faith' বলিয়া সম্ভাষণ জানাইতে প্রয়াসী হইবেন না। সে যাহাই হউক, 'আনন্দমঠে' যে সময়টির কথা বলা হইয়াছে, বাংলার ইতিহাসের সে যে একটা শুভ মুহূর্ত নয়, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। মীরজাফর ইংরেজের শক্তিতে শক্তিমান, স্বাধীনতা বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। দেশের অর্থ তিনি ও তাঁহার প্রভু ইংরেজ মিলিয়া প্রাণপণে শোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু দরিদ্র প্রজার জীবন-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এই সময়ের একটা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া বইখানি লিখিত (সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ)। বিদ্রোহ মুসলমানের বিরুদ্ধে, কারণ মুসলমান বাঙালী হইয়াও বাংলার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পলাশী-ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দুর কাপুরুষতার অভিযোগ শুনিয়া বঙ্কিম স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ মুসলমান সেখানে বাংলার শত্রু নয়, মিত্র—বাংলার একটা বিরাট অংশ। তাহা ছাড়া, 'আনন্দমঠে'

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কারণ তখনকার মুসলমান-শাসন দেশে শৃঙ্খলা-স্থাপনে অকৃতকার্য্য। ইংরেজের শ্রেষ্ঠ দান জাতীয় চেতনা, বঙ্কিম তাহাই কামনা করিয়াছিলেন। তাহার অভাবে একতা আসিবে না, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় মারামারি করিয়া মরিবে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ কিছুই হইবে না। তাই তিনি বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এক বৃহত্তর বাংলার স্বপ্ন দেখিয়া, সে বাংলার দুই সন্তান—হিন্দু ও মুসলমান—সমস্ত ধর্ম্ম ছাড়িয়া মাতৃভূমির পূজায় প্রাণমন উৎসর্গ করিবে।

শ্রীসুনীলকুমার বসু

"আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস, বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের দুঃখের মানদণ্ড। দিবসগণনায় সুখ আছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভগবদ্‌গীতা

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মজীবনে ভগবদ্‌গীতার বিশিষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। মহাভারত—ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এই ভগবদ্‌গীতার সম্পর্কে প্রাচীনেরা বলিতেন—গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিম্ অন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই গীতাকে সুগীতা করিয়াছিলেন—প্রাচীন বয়সে তিনি সতত গীতা পাঠ করিতেন, গীতার অধিকাংশ শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল—বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, মৃত্যুশয্যায় শুইয়া তিনি একান্ত মনে গীতার আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র গীতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি একাধিক স্থলে ভগবদ্‌গীতাকে জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়াছেন।* "ঈশ্বর জানিব কিসে?" এ প্রশ্নের তিনি উত্তর দিয়াছেন—'হিন্দু শাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে—প্রধানতঃ গীতায়' (ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চদশ অধ্যায়)।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ সাহিত্যিক অবদান—তৎপ্রণীত গীতাভাষ্য। ঐ গীতাভাষ্য ১২৯৩ বঙ্গাব্দের 'প্রচারে' প্রকাশিত হইতে সুরু হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ভাষ্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—উহা চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের কয়েক বৎসর পরে—১৩০৯ ভাদ্র মাসে উহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ঐ ভাষ্যের এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র গীতোক্ত ধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।" ইহার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বের

---

* ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন (অষ্টাদশ অধ্যায়) ও দেবী চৌধুরাণী (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)।

খ ক্রোড়পত্রে লিখিয়াছিলেন—'যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্যপ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।" "এমন আশ্চর্য ধর্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই।" (ধর্মতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়)।

বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যাখ্যাত যে অপূর্ব অনুশীলনতত্ত্ব *—স্বদেশবাসীর অভ্যুদয়কল্পে যাহা তাঁহার অমূল্য দান—ঐ 'অনুশীলনতত্ত্ব' গীতার নূতন ব্যাখ্যা মাত্র†—কারণ, তাঁহার মতে "ভগবদ্গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত, ঐ ধর্ম অনুশীলনের উপরই প্রতিষ্ঠিত" (ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়)।

গীতা কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজোক্তি—যা সাক্ষাৎ পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিঃসৃতা? এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন—তং ধর্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈঃ উপনিববন্ধ অর্থাৎ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে যে ধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, সর্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস (যোগধারণার দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া) সাত শত শ্লোকে গীতায় তাহা গ্রথিত করিয়াছেন। অতএব শঙ্করের মতে, গ্রন্থন-কার্য বেদব্যাসের এবং যে উপদেশ গ্রথিত হইয়া গীতাগ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ তো আর যুদ্ধক্ষেত্রে

* 'The substance of Religion is culture—the fruit of it the higher Life'—আচার্য সীলির এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি favourite quotation ছিল।

† ধর্ম্মতত্ত্ব—ষোড়শ অধ্যায়

অনুষ্টুভ ছন্দে শ্লোক রচিয়া অর্জুনের 'কশ্মল' অপনোদন করেন নাই—বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, গীতার সাত শত শ্লোকের মধ্যে সঞ্জয়ের উক্তি ৪৫টি শ্লোক, ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি ১টি শ্লোক, অর্জুনের উক্তি ৮৪টি শ্লোক এবং বাকি ৫৭০টি শ্লোক মাত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে স্থাপিত।

শঙ্করাচার্যের উত্তর শুনিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর কি? "শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।" * কি কারণ? বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম কৃষ্ণ-প্রচারিত, কি গীতাকার-প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতাপর্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাভারতকার যে ধর্ম-ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম, তবে বলিব এই ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে

* ধর্মতত্ত্ব—ষোড়শ অধ্যায়

এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে, গীতোক্ত ধর্ম যথার্থই কৃষ্ণ-প্রণীত বটে।" (কৃষ্ণ চরিত্র, ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। এই সকল কথা নিপুণভাবে প্রতিপন্ন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঐ খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে বলিতেছেন—"যে নিষ্কাম ধর্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে, এইরূপ অতি মহৎ ধর্মোপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়।"

এই ধর্মোপদেশকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোকহিতকর সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।... এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত।"

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।" (কৃষ্ণচরিত্র, ৪র্থ খণ্ড—নবম অধ্যায়)

পুনশ্চ—"আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধর্ম অন্য কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি

সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজসঙ্কলিত গ্রন্থে কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্তা সম্বন্ধে "প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ-মুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকান্‌ অলিখৎ"।—ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, "কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে ব্যরচৎ।" (গীতাভাষ্য, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

প্রচলিত গীতা 'কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ' (সংবাদ = কথোপকথন, Dialogue)। এই 'সংবাদ'কে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসময়ে কৃষ্ণার্জুনে এই কথোপকথন হইযাছিল, ইহা বিশ্বাস কবা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা কবিয়া কৃষ্ণপ্রচাবিত ধর্মেব সাব মর্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পাবে।

"যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যাযেই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "যুদ্ধ কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্‌ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহাব করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

"এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল তাহাতে

বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে একপক্ষেব সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন কবিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড সম্ভবপব বলিযাও বোধ হয় না।”—গীতাভাষ্য, ২৯-৩০ পৃষ্ঠা।

এ সম্পর্কে আমাব কিছু বক্তব্য আছে—সংক্ষেপে বলিতে চাই। এক্ষণে আমবা যে মহাভাবত প্রাপ্ত হই, উহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতিব মহাভারত। এ মহাভাবত প্রায একলক্ষ শ্লোকাত্মক—

একং শতসহস্রন্তু ময়োক্তং বৈ নিবোধত—আদি ১।১০৯

ইদং দশসহস্রং হি শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।

সত্যবত্যাত্মজেনেহ ব্যাখ্যাতম্ অমিতৌজসা॥—আদি ৬২।১৪

সেই জন্য এ মহাভাবতেব নাম ‘শতসাহস্রী সংহিতা’।

আদি পর্বেব দ্বিতীয অধ্যাযে এই মহাভারতেব একটি পর্বসংগ্রহ আছে—ভাবতস্যেতিহাসস্য শ্রূযতাং পর্বসংগ্রহঃ

(পর্বসংগ্রহ = Table of Contents)।

সংগ্রহকাব বলিতেছেন—ভীষ্মপর্বের চাবিটি উপপর্ব বা পর্বাধ্যায (sections)—জম্বুখণ্ডপর্ব, ভূমিপর্ব, ভগবদ্গীতাপর্ব ও ভীষ্মবধপর্ব। * ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যাযে কি আছে?

কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।

মোহজং নাশযামাস হেতুভিঃ মোক্ষদর্শিভিঃ॥—২।২৪৬

‘এই পর্বাধ্যায়ে মোক্ষদর্শী হেতু প্রদর্শন করিয়া মহামতি বাসুদেব পার্থের মোহজ কশ্মল নাশ করিতেছেন’। (‘কশ্মল’ শব্দটি আমাদের লক্ষ্যেব বিষয, কশ্মলের অর্থ অবসাদ—গীতায় অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণবাক্য স্মবণ করুন—কুতঃ ত্বা কশ্মলম্ ইদং বিষয়ে সমুপস্থিতম্)। অতএব

* পর্বোক্তং ভগবদ্গীতাপর্ব ভীষ্মবধস্ততঃ।

ভগবদ্গীতা যে সৌতির মহাভারতের অঙ্গীভূত ছিল, ইহা নিঃসংশয়, বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই—অনুশাসন ও শান্তি পর্বে এই গীতার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

সমুপোঢেষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে।
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্॥
—শান্তিপর্ব, ৩৪৮।৮

সৌতি বলেন, মহাভারতের আদিম স্তর—ভারতসংহিতা—যাহার নাম ছিল 'জয়' (জয়াখ্যং ভারতং মহৎ—স্বর্গপর্ব, ৫।৪৯)। বেদব্যাস তিন বৎসর "সদোত্থায়ী' (একনিষ্ঠ) হইয়া এই ভারত আখ্যান রচনা করেন।

ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতম্ আখ্যানং কৃতবান্ ইদম্ অদ্ভুতম্॥—আদি, ৬১।৫২

এই ভারতসংহিতা ২৪,০০০ শ্লোকাত্মক ছিল।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।—আদিপর্ব্ব ১।১০২

উহা ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়-সংবাদরূপে রচিত হইয়াছিল। এই ভারতসংহিতা পাণ্ডুর দিগ্বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া (পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা চ বিক্রমেণ চ) দুর্যোধন-বধরূপ পাণ্ডব বিজয়ে পরিসমাপ্ত ছিল (সেই জন্য ইহার নাম ছিল 'জয়')।

ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন গুরুর আজ্ঞায় অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে ঐ ভারতসংহিতা পরিবর্দ্ধিত করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাই মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর—বৈশম্পায়ন-জনমেজয়সংবাদ। এইরূপে ভারতসংহিতা মহাভারতে রূপান্তরিত হয়।

জনমেজয় প্রশ্ন করিতেছেন—

কথং সমভবদ্ভেদস্তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্।
তচ্চ যুদ্ধং কথং বৃত্তং ভূতান্তকরণং মহৎ॥

উত্তরে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—

শৃণু রাজন্! যথা ভেদঃ কুরুপাণ্ডবয়োরভূৎ।
রাজ্যার্থে দ্যূতসম্ভূতো বনবাসস্তথৈব চ॥
যথা চ যুদ্ধম্ অভবৎ পৃথিবীক্ষয়কারকম্।
তত্তেঽহং কথয়িষ্যামি পৃচ্ছতে ভরতর্ষভ!॥

—আদিপর্ব্ব, ৬১।৪-৫

তখনও মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত হয় নাই। উহা একশত অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল।

এতৎ পর্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা—২।৮৩

জনমেজয়ের সর্পসত্রেব অনেক পরে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞেব অনুষ্ঠান করেন, ঐ যজ্ঞে লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতি সমবেত ঋষিমণ্ডলীকে বৈশম্পায়নেব মহাভারত শুনাইয়াছিলেন। তাঁহারই হস্তে মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত হয়।

যথাবৎ সূতপুত্রেণ লোমহর্ষণিনা ততঃ।
উক্তানি নৈমিষারণ্যে পর্বাণ্যষ্টাদশৈব তু॥

—আদিপর্ব্ব ২।৮৪

এই সৌতিকৃত মহাভারতই প্রচলিত মহাভারত। অনেকদিন পর্য্যন্ত ভারতসংহিতা ও মহাভারত পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-শতকে রচিত আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে এই সূত্রটি দৃষ্ট হয়—পৈল-সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-সূত্রভাষ্য-ভারত-মহাভারতধর্মাচার্যাঃ যে চান্যে আচার্যাস্তে সর্বে তৃপ্যন্তু।—গৃহ্যসূত্র, ৩।৪

কাহার তর্পণ করিতে হইবে—ইহার উত্তরে আশ্বলায়ন বলিতেছেন, "বেদের সংহিতাকর্তা পৈল জৈমিনি সুমন্তু ও বৈশম্পায়ন এবং

ভারত-(সংহিতা)-কর্তা এবং মহাভারতকর্তা—এই সকল আচার্যের তর্পণ করিতে হইবে।"

আমরা দেখিয়াছি, ভগবদ্‌গীতা সৌতির মহাভারতের অঙ্গীভূত ছিল। গীতা যে বৈশম্পায়নের মহাভারতেরও অঙ্গীভূত ছিল—এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন এই—আদিম ভারত-সংহিতায় গীতা ছিল কি না, এবং যদি ছিল, কি আকারে ছিল? আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ নামে যে প্রসঙ্গ আছে, তাহার একটি শ্লোক এই—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥—১।১৪৩

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিপুণভাবে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ঐ ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ চব্বিশহাজার শ্লোকাত্মক মহাভারতের সূচিপত্র। উহার আরম্ভ ছিল অর্জুনের লক্ষ্যভেদ হইতে এবং শেষ ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত। অতএব দেখা যাইতেছে ভারতসংহিতায় গীতার যাহা প্রধান ঘটনা—শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। এই বিশ্বরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' লিখিয়াছেন—"মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বের ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) বিশ্বরূপ-প্রদর্শন বর্ণিত আছে…গীতার একাদশের বিশ্বরূপ বর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে এমন আর কিছু পাওয়া দুর্লভ"।

এই সম্বন্ধে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমার আলাপের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সে প্রায় ৪৫ বছরের কথা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

-সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রের বঙ্কিমসংখ্যায় আমি ঐ আলাপের বিবরণ দিয়াছিলাম। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ কবিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব কথাব সার এই ছিল যে, আদিম গীতাব শেষ হইয়াছিল ঐ বিশ্বরূপ-প্রদর্শনে এবং পববর্তী কালে গীতাব অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি সংযুক্ত কবা হইয়াছে। এ মত যে সম্পূর্ণ সমীচীন, তাহা আমাব বোধ হয না। কেন বোধ হয় না তাহা আমি ঐ 'নারাযণ' পত্রে প্রকাশ কবিয়াছিলাম। তবে একথা ঠিক যে, ভাবতসংহিতাব অন্তর্গত যে গীতা —যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে—এই শ্লোকে যে গীতাব প্রতি লক্ষ্য কবা হইয়াছে—সে গীতা 'কৃষ্ণং লোকান্ দর্শযানং শবীবে' এই বিশ্বরূপ-প্রদর্শনেই অবসিত ছিল। বিশ্বরূপ দেখিয়া যদি অর্জুনেব মোহজ কশ্মল বিদূবিত না হয, তবে তাঁহাব নিকট ক্ষবাক্ষব-যোগ ও গুণত্রয বিভাগ ইত্যাদি বর্ণন কবা একবারে ব্যর্থ নয কি?

শ্রীহীবেন্দ্রনাথ দত্ত

"আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমাব এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই! এখন যেমন লোকে, উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা এক দিন ফলিবে!"

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

কোনও জাতিব যখন সৌভাগ্যের উদয হয তখন সহসা দেখা যায সমাজ, সাহিত্য ও বাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নানা দিক্ দিয়া নানা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়া তাঁহারা সমবেত চেষ্টাব দ্বাবা সমগ্র জাতিব চিন্তা ও কর্ম্মকে অধঃপতনেব নিম্নভূমি হইতে উন্নতিব শিখবে তুলিযা ধরেন ; দেবতাব এমন অযাচিত কৃপা কেন যে এককালে একই জাতির উপর বর্ষিত হয়, সহজ বুদ্ধিতে তাহা বুঝিতে না পাবিয়া আমবা বিস্ময় অনুভব করি। উনবিংশ শতাব্দীব তৃতীয দশক হইতে আবম্ভ কবিয়া সপ্তম দশক পর্য্যন্ত (১৮২০-১৮৭০ খ্রীঃ) অর্দ্ধশতাব্দীকাল মাত্র একবার বাঙালী জাতির এই অসম্ভব সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল , জ্ঞানে ও কর্ম্মে, ধর্ম্মে ও বাষ্ট্রে, সাহিত্যে ও সমাজে পব পব বহু কীর্ত্তিমান্ পুরুষেব আবির্ভাবে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি সমগ্র পৃথিবীতে গৌরব অর্জ্জন কবিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাব আকস্মিক সংঘাত এবং বামমোহন-রাধাকান্তের প্রতিক্রিয়ামূলক ভারতীয় সংস্কৃতির নব-জাগরণ, পরবর্ত্তী মনীষী-সম্প্রদায়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্র কতখানি প্রস্তুত কবিযাছিল বিচাব-বিতর্কের দ্বারা তাহা স্থিব করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মূলে যাহাই থাকুক, ফলভোগ আমরা করিয়াছি এবং আজও করিতেছি। ঈশ্বরচন্দ্র (১৮২০ খ্রীঃ), মধুসূদন, বাজেন্দ্রলাল, হরিশ্চন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিম, কেশবচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, সুবেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন (১৮৭০ খ্রীঃ) ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও

সাহিত্যের সকল শ্রেষ্ঠ নেতাই এই স্বল্পকালের মধ্যে বঙ্গভূমির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ভাস্বর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-বিভাগের যুগাবতার। যুগসন্ধিক্ষণে অবতারের আবির্ভাবের একটা অমোঘ কারণ অবশ্যই ঘটে। বঙ্কিম-জন্মের এই কারণটি বুঝিতে হইলে সমসাময়িক এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সাহিত্যের অবস্থা জানা আবশ্যক। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধভাঙা বন্যা-স্রোতের মত পাশ্চাত্য ভাবধারা আমাদের সঙ্কীর্ণ গৃহ-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়া দিল, নূতনের সংঘর্ষে পুরাতনের ভিত্তি টলিল। আদর্শের এই মহাসংঘাতে কিছু দিন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাইয়া যখন একটা কাজ-চলা-গোছ বোঝাপড়া হইল, তখন দেখা গেল বাঙালী প্রধানতঃ বাহিরের দিকেই মুখ ফিরাইয়াছে।* এই সময়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক জন সবল সুস্থ সমন্বয়কারী পুরুষের একান্ত প্রয়োজন ঘটিল। ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ়, রবিবার রাত্রি নয়টার সময় (ইংরেজী ১৮৩৮, ২৭শে জুন) কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হইল।

আজ হইতে ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গমাতার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ এবং পঞ্চান্ন বৎসরের কীর্ত্তিবিভূষিত মর্ত্ত্য-জীবন যাপন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নিকট ব্যক্তিসত্তা হারাইয়া একটা 'আইডিয়া' মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এখন ভারতীয় হিন্দুর নবজাগরণের প্রতীক। তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উপলক্ষে তাঁহার মহিমা আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে, বাঙালী অবাঙালী সকলেই তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন। এই সকল বহুধাবিস্তৃত স্মরণ-সম্ভাষণের

* এই সংঘর্ষের ঘনিষ্ঠ ইতিহাস যাঁহারা জানিতে চান তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত তিন খণ্ড 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পড়িতে হইবে।

মধ্যে যে একটি অবিসম্বাদিত তথ্য আমরা আহরণ করিতে পারিতেছি তাহা এই যে, প্রতিভা মরে না, দেশকালপাত্রের উর্দ্ধে মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত তাহা উত্তরোত্তর ভাস্বরই হইতে থাকে।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বহু জনে বহু ভাবে দেখিয়াছেন, কেহ কবিরূপে, কেহ ঋষিরূপে, কেহ ঔপন্যাসিক-হিসাবে—কেহ বা জাতীয় যজ্ঞের প্রথম হোতারূপে তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন। এই সকল প্রশস্তি-প্রবন্ধ নানা পুস্তক, পুস্তিকা, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকের পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবন ও কীর্ত্তির একটা সুষ্ঠু ধারাবাহিক ইতিহাস আজিও রচিত হয় নাই। অথচ বর্ণনা করিবার মত এই একটি মাত্র জীবন বাঙালী বহুভাগ্যফলে নিজের মধ্যে লাভ করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবনেতিহাস আজিও অলিখিত থাকার পুরা অপরাধ বাঙালী জাতির নহে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং আপনার কীর্ত্তিকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া আপনি অন্তরালে থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ১৩১৮ আষাঢ় সংখ্যা হইতে 'বঙ্কিম-চরিত' রচনার নামে যে ছেলেখেলা করেন (পাঁচ সংখ্যা ধরিয়া) তাহার সূত্রপাতে লিখিয়াছেন,

> মাতামহদেব স্বর্গারোহণের সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে যেন কেহ তাঁহার জীবনচরিত না লেখে! ঠিক দ্বাদশ বৎসরের পরেই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, দেশের লোক তখন হইতে সেই সাহিত্য-সম্রাটকে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষিজ্ঞানে অধিকতর ভক্তিভরে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে মহাপুরুষ কি উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবনচরিত দ্বাদশ বর্ষ লিখিতে নিষেধ করিয়া যান, সে রহস্য সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠা কঠিন,...আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ করি, ইহাও বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল।...তাঁহার স্বরচিত আত্মচরিত অবলম্বনে আমাদের তত্ত্বাবধানে তাঁহার যে বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিত হইতেছে, তাহা প্রকাশে কিছু বিলম্ব আছে।

দ্বাদশ বৎসর পার হইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইতে চলিল, দিব্যেন্দুবাবুও ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু বঙ্কিমের 'স্বরচিত আত্মচরিত অবলম্বনে রচিত' জীবনী আর বাহির হইল না! দিব্যেন্দু-বাবুব এক সহোদর আজিও জীবিত আছেন, তিনি যদি 'স্বরচিত আত্ম-চরিত'টুকুই যথাযথ প্রকাশ কবিতেন, তাহা হইলেও হয়তো আমাদের ক্ষোভ কিয়ৎ পরিমাণে মিটিত, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদেব, এই কীর্ত্তিমান পুরুষের গোপন ও গূঢ় সাধনেতিহাস আজিও অজ্ঞাত রহিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুব অভাব ছিল, যে দুই চাবি জন ছিলেন, বঙ্কিমের জীবনকাহিনী সাধাবণ্যে প্রচাবেব জন্য তাঁহারাও জীবিত ছিলেন না। তিনি পত্রাদি অতি অল্প লিখিতেন, তাঁহার যে অল্প কয়েকটি পত্র * আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সেগুলিবও অধিকাংশ নিতান্ত মামুলি প্রয়োজনের তাগিদে লেখা। কোথাও তিনি চকিতের জন্য আপনাকে উদ্ঘাটন করিয়া দেখান নাই। তাঁহার বচনাব মধ্য দিয়া তাঁহাব যে চরিত্রের পরিচয় পাই, তাহাতে বোধ হয়, ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। একান্ত বন্ধুসমাগম ব্যতিরেকে তিনি সাধারণ মজলিসে কখনও প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন না, আপন অটল গাম্ভীর্য্যেব মধ্যে ধ্যান-সমাহিত হইয়া থাকিতেন। আমাদের বিশ্বাস, নিজের জীবনস্মৃতি তিনি কখনও লেখেনও নাই—মুখে কাহাকেও কখনও বলেনও নাই। কেহ কিছু জানিতে চাহিলে বরঞ্চ বিবক্তি প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছেন। বাংলা দেশের সে যুগের কাহিনী লইয়া অনেকে স্মৃতিকথা (নিজের ও পরের) লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন, সেই গগনচুম্বী ব্যক্তিপুরুষকে বাদ

* সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কিছু অধিকসংখ্যক পত্র দেখিয়াছি, কিন্তু সেগুলি নিতান্ত পারিবারিক পত্র, সাধারণের বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে না।

দিয়া চলিবার সাধ্য যদিচ কাহারও হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে প্রচার করিবার মত সংবাদও বিশেষ কেহ দিতে পারেন নাই, তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

কিন্তু তাঁহার জীবনের উপযুক্ত উপকরণ না পাইলেই কি ভক্তজন নিরস্ত হইবে? পঞ্চাশ-পৃষ্ঠাব্যাপী উপকরণকেও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া ৬০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী জীবনী রচনা করা যায়, গালগল্প ও পারিবারিক কিম্বদন্তীকে ভক্তজন সহ্য করিতে বাধ্য হয়। তাহা ছাড়া জীবনী না থাকিল, রচনা তো আছে! শেক্সপীয়রের জীবনীর অভাবে তাঁহার পরবর্ত্তী কালের কবি ও সমালোচক এবং ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনীকারেরা তাঁহার কবিতা ও নাটক বিশ্লেষণ করিয়া মনের ও পকেটের ক্ষোভ মিটাইয়াছেন, নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার লুপ্ত ব্যক্তিত্বের সন্ধান সংগ্রহ করিয়া পাঠক ভুলাইয়াছেন—বঙ্কিমকে লইয়া অনেকে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার কমলাকান্ত, তাঁহার গৌরদাস বাবাজী অথবা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও কীর্ত্তির মধ্যে তাঁহাকেই সন্ধান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াসের অন্ত নাই। আমরাও উপন্যাস-বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষুরধার প্রতিভার স্পর্শ পাইলাম মনে করিয়া তৃপ্ত আছি। ভক্ত যেমন আকারহীন শালগ্রাম-শিলাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া মনের আবেগ চরিতার্থ করে, আমরাও বঙ্কিম সম্বন্ধে তাহাই করিতেছি। সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার চরিত্রের সন্ধান মিলিতে পারে, কিন্তু জীবনীর সন্ধান মেলে না।

বঙ্কিমের যতগুলি জীবনী এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র) প্রণীত 'বঙ্কিম-জীবনী'ই*

* বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগিনেয় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, এই পুস্তিকা আমরা সংগ্রহ করিতে

(৩য় সংস্করণ, ১৩৩৮) উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ভুলভ্রান্তি আছে, অসঙ্গতি আছে এবং কিছু অধিকপরিমাণ বক্তৃতা ও গালগল্প আছে, তৎসত্ত্বেও উপকরণের দিক্ দিয়া ইহাই আমাদেব অবলম্বন। সুবেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য,' 'নাবায়ণ,'+ 'সাধনা' ও 'প্রদীপ' প্রভৃতি সাময়িক পত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া যে 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' প্রকাশ কবিয়াছিলেন, তাহা হইতে বঙ্কিম-চরিত্রের কিছু পবিচয় পাওয়া যায়। নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' ও 'সচিত্র শিশিবে' দিব্যেন্দুবাবু কিছু কিছু ভৌতিক ও আধিদৈবিক উপকরণ যোগ দিযাছেন। তাহা ছাড়া অসংখ্য সামযিক পত্রিকাব অসংখ্য প্রবন্ধে বঙ্কিম-জীবনীর মালমশলা আছে। এইগুলি হইতেই ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতিব পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে।

বঙ্কিমের ছাত্রজীবন (হুগলী ও প্রেসিডেন্সী কলেজ), বিশ্ববিদ্যালয়েব পবীক্ষা, বাল্যরচনা ও কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে এত কাল সঠিক ইতিহাস আমাদেব জানা ছিল না, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃত পবিশ্রমে এই ইতিহাস যত দূব সম্ভব সম্পূর্ণ করিযাছেন। বঙ্কিমেব পুস্তক ও বচনাব তালিকাও তিনি প্রস্তুত করিযাছেন। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীকে কেন্দ্র করিয়া—বিশেষভাবে ১৩২১ চৈত্রের 'মানসী'তে উক্ত পুস্তকেব প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায-কৃত সারাংশ অবলম্বনে এবং পরবর্ত্তী গবেষকগণের সহায়তায় যথাসাধ্য সংশোধন ও পবিবর্দ্ধন করিয়া নিম্নলিখিত সংক্ষেপ জীবনী প্রস্তুত হইল।

পারি নাই। শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্তের মতে শচীশবাবু এই গ্রন্থ হইতে বহু উপকরণ আত্মসাৎ করিয়াছেন।

+ ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা (বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা) 'নারায়ণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জীবনী:—

অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সংগ্রহ 'সঞ্জীবনী-সুধা'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাদের বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ও যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই জন—শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র; কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য, 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় সম্পাদক এবং 'পালামৌ', 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা'র লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন।

পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেন, অল্প বেতনের সরকারী চাকরি করিতে করিতেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের (বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বৎসরে) জানুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১২৮৭ সালের ১৩ই মাঘ ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের 'হাতেখড়ি' হয়। পরে গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় রামপ্রাণ সরকার বাড়িতে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশব হইতেই মেধাবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে আগমন করেন, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে তিনি সেখানকার ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহোদর এবং প্রায়-সহাধ্যায়ী পূর্ণচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে।...তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ.৪২।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান।... শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটী হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। ...তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।...মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন session খুলিলে, তথায় ভর্ত্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল।—ঐ, পৃ. ৩৪-৩৬।

সৌভাগ্যক্রমে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই শৈশব-শিক্ষার সামান্য বর্ণনা দিয়াছেন—

আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন, কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুরে গেলাম। সেখানে তিন চারি

বৎসর কাটিল।...পরীক্ষার (জুনিয়র স্কলারশিপ, সঞ্জীবচন্দ্রের) অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম...।

মেদিনীপুরে অবস্থানকালে (১৮৪৪-৪৮ খ্রীঃ) ইংরেজী স্কুলের হেডমাস্টার টিড সাহেব ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মলেট সাহেবের গৃহে তাঁহার খুব বেশি যাতায়াত ছিল।*

"কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা শিখিলেন।"* শ্রীরাম শিরোমণি ('ন্যায়বাগীশ'—পূর্ণচন্দ্র) নামক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট তিনি পাঠ লইতেন।† "বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত।" 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জনে'র অনেক কবিতা তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার সংস্কৃত আবৃত্তি শুনিয়া প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের কথা শুনাইতেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণন ও গীতগোবিন্দের 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' কবিতাটি তিনি প্রায়ই আওড়াইতেন।* শৈশবে হলধর তর্কচূড়ামণির নিকট তিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র"।‡ এই বীজ হয়তো উত্তরকালে 'কৃষ্ণচরিত্র'-রূপ মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধুলা ভালবাসিতেন না—তাঁহার শরীর এই কারণে অপটু ছিল। তিনি তাসখেলা পছন্দ করিতেন। "বঙ্কিমচন্দ্র

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩৫-৩৮।

† অক্ষয় দত্তগুপ্ত—'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ৩৩।

‡ 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৪১।

চিরকালই ষাঁড় গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না···কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না।"* অথচ মাঝে মাঝে বৃহৎ ব্যাপারে অসম-সাহস দেখাইতেন। ইতিহাস-অধ্যয়নে বাল্যকাল হইতেই তাঁহাব ঝোঁক ছিল।†

মেদিনীপুব হইতে কাঁঠালপাড়া প্রত্যাবর্ত্তনেব কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়াবি মাসে কাঁঠালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামেব পঞ্চমবর্ষীয়া একটি সুন্দবী বালিকাব সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ অক্টোবব তাবিখে ১১½ বৎসব বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রবেশ কবেন। তিনি নৌকাযোগে কাঁঠালপাড়া হইতে হুগলী যাতায়াত কবিতেন,—একটি ছোট ডিঙ্গি এই কার্য্যেব জন্য মোতায়েন থাকিত। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয বঙ্কিমচন্দ্রেব এই নৌকা-ভ্রমণেব অনেক গল্প তাঁহাব স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ কবিযাছেন।

হুগলী কলেজে পডিতে পডিতেই 'সংবাদ প্রভাকবে' প্রকাশিত ঈশ্বব গুপ্তের বচনাব আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য পদ্য রচনা সুরু করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়াবি তারিখেব 'সংবাদ প্রভাকবে' সম্ভবতঃ তাঁহাব প্রথম বাল্যরচনা প্রকাশিত হয়, তাঁহার বয়স তখন ১৪ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। বচনাটি একটি কবিতা, তাহার প্রথম চরণ এইরূপ—

চন্দ্রাস্য সহাস্য করে, উষাকালে সতী।
প্রিয়করে করি করে, কহে পতি প্রতি।

দুই বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গদ্য পদ্য রচনা ঈশ্বর

---

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৪৫।

† দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১৩১৮।

গুপ্তের প্রশস্তি সমেত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে।* 'রচনা-প্রতিযোগিতা' ও 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' এগুলিব অন্তর্গত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা-প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ হয, বঙ্কিমচন্দ্র রঙ্গপুরেব তুষভাণ্ডারের জমিদার বমণীমোহন রায চৌধুবী ও কুণ্ডিব জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক দশ মুদ্রা করিযা কুড়ি মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করেন। দ্বারকানাথ অধিকারী (কৃষ্ণনগব কলেজ), দীনবন্ধু মিত্র (হিন্দু কলেজ) ও বঙ্কিমচন্দ্রেব মধ্যে 'কালেজীয কবিতাযুদ্ধ' হইত।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেব ১০ই জুলাই 'সংবাদ প্রভাকবে' বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রথম গদ্য বচনা প্রকাশিত হয।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাব 'ললিতা ও মানস' পযাবাদি বিবিধ ছন্দে রচনা কবেন।

১৮৫৪ সনেব এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়ব স্কলাবশিপ পবীক্ষা দেন। পবীক্ষায প্রথম হইযা তিনি দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পান।

১৮৫৬ সনেব এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিযব স্কলারশিপ পবীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকাব করিযা দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ কবেন।

এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৫৬ সনের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুবাকালিক গল্প। তথা মানস।' কলিকাতার

* 'যখন চৌদ্দ পনর বৎসর বয়ঃক্রম,...নৌকাতে অবস্থিতিকালে বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যঃ একটী গীত রচনা করিলেন।...কিছুদিন ঐ গানটি মল্লার রাগিণীতে প্রচলিত ছিল, পরে লুপ্ত হইয়া যায়। গানটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে, আর নাই, যথা:—"হাবালে পর পায় কি ফিরে মণি—কি ফণিনী, কি রমণী?"'—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৩১-৩২।

'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত' হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহা ৪১ পৃষ্ঠার একটি কাব্যগ্রন্থ। ২৮ জুলাই ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' পুস্তকটি ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রশংসিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ১২ই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন ক্লাসে ভর্ত্তি হন। দ্বারকানাথ মিত্র ব্যতীত বঙ্কিমের তুল্য মেধাবী ছাত্র হুগলী কলেজে আর কেহ হয় নাই।

হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে বঙ্কিমচন্দ্র স্কুলের পাঠ্য ছাড়া ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি খুব বেশি পরিমাণে পড়িতেন*, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য ও কাব্যও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বকলণ্ড লিখিয়াছেন, "He took a prominent part in the students' Debating Club"। হুগলী কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার উদ্যান-রচনার সখ হয়। এই সখ তাঁহার বরাবর ছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবর্ত্তিত এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও এই বৎসরে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাস করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি এ. পরীক্ষায় যে দশ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের এক জন। তিনি প্রথম স্থান অধিকার (দ্বিতীয় বিভাগ) করেন। আর এক জন মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—তাঁহার নাম যদুনাথ বসু। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে উভয়কে বি. এ উপাধি দেওয়া হয়।

---

* 'At College Bankim Chandra was a voracious reader of history, and he always longed to be a distinguished historian'.
—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বি. এ. পরীক্ষা দিবার পরও বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে থাকেন। ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত তিনি হাজিরা দিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি গোলদীঘির ধারে একটি বাসা করিয়া থাকিতেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—

প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম।...এখন যেখানে সিটি কলেজ, তাহার পশ্চিম ধারের তেতালা বাড়ী হইতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়ী হইতে, আরদালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন শ্রেণীর গ্যালারিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।—বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৫৩৪।*

এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রেব শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হইল। পরবর্ত্তী কালে ছাত্র-জীবনেব কথা উল্লেখ কবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন—

আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখি নি। হুগলী কলেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশান বাবুর [ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] কাছে। ক্লাসে কখনও থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড বেশী হযেছিল। বাপ থাক্‌তেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি, নীতিশিক্ষা কখনও হয় নি।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১৯৪।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট 'ক্যালকাটা গেজেটে' ৬ই আগস্ট তারিখের লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নরেব অর্ডারে যশোহরেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর রূপে তাঁহার নিয়োগ বিজ্ঞাপিত হয়। ৭ই আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরির দিন গণনা করা হইলেও সম্ভবতঃ তিনি ২৩এ

* খুব সম্ভব অক্ষয়বাবু স্মৃতিকথায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

আগস্ট প্রথম কার্য্যে যোগদান করেন। যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়,* এই পরিচয় উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। যশোহরে অবস্থানকালে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়।

পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন †, সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,…।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ জানুয়ারি তিনি যশোহব হইতে মেদিনীপুরের নেগুয়াঁ মহকুমায় বদলি হইলেন, ৭ই ফেব্রুয়ারি নেগুয়াঁ পৌছিয়া তিনি ৯ই তারিখে সেখানকাব কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুবী-বাড়ির কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হইল। দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নীকে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মস্থানে লইয়া গেলেন। নেগুয়াঁয অবস্থানকালে সমুদ্র অরণ্যের শোভা দেখিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র বীজ তাঁহার মনে উপ্ত হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলি হন এবং সেখানে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি 'এডুকেশন গেজেটে' কিছু কিছু লিখিতেন। তাঁহার ইংরেজী উপন্যাস 'Rajmohan's Wife' এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' এখানেই অংশতঃ রচিত হয়। 'Rajmohan's Wife' কিশোরীচাঁদ

---

* পূর্ণচন্দ্রের কথায়—প্রভাকরে লিখিবার সময় 'পত্রের দ্বারা…ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল।…সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা, কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত।'

† বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরির ইতিহাসে এই ছুটির উল্লেখ নাই।

মিত্র-সম্পাদিত *Indian Field* পত্রে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। *

শচীশবাবু-প্রোক্ত ('বঙ্কিম-জীবনী', পৃ. ১০৮) বঙ্কিমচন্দ্রের *Adventures of a Young Hindu* নামক উপন্যাসের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা ঐ কালেই রচিত হওয়া সম্ভব।

C. E. Buckland তাঁহার *Bengal under the Lieutenant-Governors* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনা-শাসন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

While in charge of the Khulna sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river *dacoities* and establishing peace and order in the eastern canals....

While at Khulna Bankim Chandra began a serial story named "Rajmohan's Wife" in the *Indian Field* newspaper, then edited by Kisori Chand Mitra. This was his first public literary effort.—P. 1079.

১৮৬৪ সনের ৫ই মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণার বারুইপুর মহকুমায় বদলি হন। এখানে তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছিলেন, মধ্যে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য ডায়মণ্ড হারবার (১৮৬৪, অক্টোবর) ও আলিপুরে (১৮৬৭, আগস্ট) বদলি হন। এই সময়েই (১৮৬৭, মে) গবর্ণমেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্দ্ধারণের জন্য কমিশনের সম্পাদকত্ব করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে অসুস্থতার জন্য দেড় মাস ও ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে ব্যক্তিগত কাজে ছয় মাস ছুটি লন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্কিম-জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর; এই বৎসরে

* ১৯৩৫ সালে এই পুস্তক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে বাহির হইয়াছে।

তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র আখ্যা-পত্রটি নিম্নলিখিত রূপ ছিল—

দুর্গেশনন্দিনী।

ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৬৫।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩০৭।

বারুইপুরে অবস্থানকালেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষাংশ লিখিয়া থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত মহাশয় ১৩০৬ সালের 'প্রদীপে' (পৃ. ২১৯) লিখিয়াছেন—

এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে—তাঁহার study roomএ প্রস্থান করিতেন...।

'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী'ও এই সময়ে রচিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। 'মৃণালিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কিছু দিনের জন্য কাশী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। মধ্যে অস্থায়ী ভাবে তিনি বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্শন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টের কাজ করেন (১৮৭১, এপ্রিল), এবং শেষের তিন মাস অসুস্থতাবশতঃ ছুটি লন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

বঙ্কিম-জীবনের বহরমপুরের এই কয়েক বৎসর বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। বহু দিন হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাসনা ছিল, একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। যোগাযোগের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই —১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, (বঙ্গাব্দ ১২৭৯ বৈশাখ) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুরের ১ নং পিপুলপটী লেন হইতে সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চ্চার যেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব, ঐতিহাসিক রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গাঙ্গুলী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন উকিল)—এই বিরাট সাহিত্য-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের শুভাগমন হইল। পরে রমেশচন্দ্র দত্ত আসিয়া যোগ দিলেন।

এই খ্যাতনামাদের দলেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে তাঁহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য লইয়া স্বতন্ত্র থাকিতেন, এই জন্য তিনি নিন্দাভাজন হইতেন। 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশেব উন্মাদনা তাঁহাকে অনেকটা সামাজিক করিয়া তুলিল; বাংলা লিখিবার ও লেখাইবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'ব সূচনাতে এই উন্মাদনার আভাস আছে। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাবে পড়িয়া সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র বাংলা লিখিতে প্রতিশ্রুত হন। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠতা এইখান হইতেই।

বহরমপুরে অবস্থান কালে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কিন্তু কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। 'On the origin of Hindu Festivals' ও 'A Popular Literature for Bengal' নামক প্রবন্ধ দুইটি তিনি Bengal Social Science Association-এ পাঠ করেন—প্রথমটি বহরমপুবে আসিবার পূর্ব্বেই পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ দুইটি উক্ত সমিতির বিববণী-বহিতে যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' ত্রৈমাসিকেব ১০৪ ও ১০৬ (১৮৭১) সংখ্যায় যথাক্রমে তাঁহার 'Bengali Literature' ও 'Buddhism and the Sankhya Philosophy' বেনামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনে'র শম্ভুচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৮৭২ ডিসেম্বর ও ১৮৭৩ মে মাসে যথাক্রমে উক্ত পত্রে তাঁহার 'The Confessions of a Young Bengal' ও 'The Study of Hindu Philosoply' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শম্ভুচন্দ্র মুখুজ্জের নিকট এই সময়ে লিখিত কয়েকটি পত্র 'বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্টে' বাহির হইয়াছে।

'বঙ্গদর্শনে' পর পর 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' খণ্ডশ বাহির হইতে থাকে—বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধ এই সময়ে

তিনি লিখিয়া প্রকাশ করেন। বহরমপুর থাকা কালেই 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' ১৮৭৩ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের সহিত এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ লইয়া বহরমপুরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই বিবাদ আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৮০) কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গদর্শন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা ভবানীপুর হইতে 'বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়' সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভ্রমর' নামক একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র কাঁঠালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে লিখিতেন ও ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণা জিলার বারাসত মহকুমায় বদলি হন এবং সেখানে কয়েক মাস থাকিতে না থাকিতেই অক্টোবর মাসে মালদহে রোড-সেসের কাজে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুন হইতে দীর্ঘ অবসর (প্রায় ৯ মাস) গ্রহণ করেন। এই সময়ে 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৫) ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' 'রজনী' আরম্ভ হয়।

নয় মাস ছুটি লইয়া কাঁঠালপাড়ায় অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। সেই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। এই সময়েই রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বেলগাছিয়াস্থিত 'এমারেল্ড বাওয়ারে' দ্বিতীয় কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলন-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দেব ১৩ই ফেব্রুয়াবি পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। শেষের দিকে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে তিনি অস্থায়ী ভাবে বর্দ্ধমান ডিবিসনের কমিশনারের পার্শন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়া হইতেই হুগলী যাতায়াত করিতেন, 'বঙ্গদর্শন' ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূরা দমে যাদবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জীবচন্দ্রের পরিদর্শনে ও বঙ্কিমের সম্পাদনায় বাহিব হইতেছিল। 'রজনী' ও 'বাধাবাণী' শেষ হইয়া 'কৃষ্ণকান্তেব উইল' ধাবাবাহিক ভাবে চলিতে চলিতেই হঠাৎ ১২৮২ বঙ্গাব্দেব চৈত্র সংখ্যা বাহিব হইয়া অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেব মার্চের শেষ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিযা দেন। 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক-সংখ্যা তখন খুব বেশি। ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদেব মধ্যে পাবিবাবিক কলহ ঘনাইযা উঠিতেছিল। যাদবচন্দ্র তাঁহার উইলে বঙ্কিমকে কাঁঠালপাডাব বাডিব অংশ দেন নাই, ভ্রাতাদের মধ্যেও সদ্ভাবেব অপ্রতুল হইতেছিল। কিন্তু এগুলি ঠিক 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ কবিবাব কারণ না হইতে পাবে। ছুটিতে কাঁঠালপাডায আরামে কাটাইযা চাকুবিতে যোগ দিবাব প্রাক্কালে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইযাছিল; চাকুবিব চাপও ইহার কারণ হইতে পাবে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দেব জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়েকটি সমালোচনা 'বিবিধ সমালোচন' নামে প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন কাঁঠালপাডার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রেব সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশের কথা হয়।

ধূমায়িত বহ্নি তখন জ্বলিয়াছে, ভ্রাতৃবিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোডাব দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার বাস উঠাইয়া চুঁচুডায একটি বাড়ি ভাড়া কবিয়া সপরিবারে উঠিয়া গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে কাঁঠালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় উহা পুনঃপ্রকাশিত হইল, অসমাপ্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমাপ্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ক্ষণভিন্নসুহৃৎ' দীনবন্ধুর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল; ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-লিখিত জীবনী সম্বলিত হইয়া দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল।

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়—'রজনী' (১৮৭৭), 'উপকথা' (ইন্দিরা, যুগালঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে ১৮৭৭), 'কবিতা পুস্তক' (১৮৭৮), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯), সাম্য (১৮৭৯) ।

চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাড়িতে কলিকাতা হইতে হেমবাবু, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অনেকে যাতায়াত করিতেন, ভূদেব বাবুর সহিত এই সময়ে তাঁহার খুবই দেখা-শোনা হইত। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ভূদেবের গৃহে সমবেত হইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন।

১৮৮০ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে চুঁচুড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নবীন-চন্দ্র সেনকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি তৎকালে ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনা করিতেছিলেন।

ডিবিশন্যাল কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট রূপেই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হাওড়ায় বদলি হন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। হাওড়ায় আসিয়াই বিচারের রায় লইয়া মাজিস্ট্রেট বকলণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের

অস্থায়ী অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী স্বরূপ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হন। ১৮৮২ সালের ২৬এ জানুয়ারি তিনি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর রূপে অস্থায়ী ভাবে ২৪-পরগণায় আলিপুরে বদলি হন; মধ্যে মে মাসে কয়েক দিন বারাসতে ছিলেন। ১৮৮২, ১৭ই মে হইতে ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত পুনবায় আলিপুরে থাকিয়া ৮ই আগস্ট তারিখে তিনি জাজপুরে (কটক) বদলি হন।

উপরোক্ত সময়েব মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বাজসিংহ' (১৮৮২) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

হাবডা হইতে কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর যাজপুর গমন পর্য্যন্ত বঙ্কিমের বাসা কলিকাতাব বউবাজাব স্ট্রীটে ছিল; সেখানে প্রায় প্রত্যহই সাহিত্যিক বৈঠক বসিত, 'আনন্দমঠে'র পাণ্ডুলিপি পড়া হইত। চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় সরকার, তারাকুমার কবিরত্ন, বলাইচাঁদ দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও সঞ্জীবচন্দ্র নিয়মিত সেই আড্ডায় জুটিতেন। বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটবীর পদটি হঠাৎ লুপ্ত হওয়াতে সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া স্টেট্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি দৈনিক পত্রে খুব লেখালেখি হয়।

'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—পজিটিভিজ্‌ম সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত। পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্যাপারে এই সময়ে বঙ্কিমের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাদ হয়। সঞ্জীবের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' তখন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ ব্লাইদকে

অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর চার্জ বুঝাইয়া দেন। সেই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকো বাটীতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিম কলেজ রি-য়্যুনিয়নেব সভায় যোগদান করেন। ৫ই ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারি) তারিখে কলিকাতায় সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হয়—সেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' বচনা করেন।

১৮৮২ সালের ৮ই আগস্ট হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দেব ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র যাজপুবে ছিলেন। ১৮৮২ সালেব নবেম্বর মাসে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনের পাদবি অধ্যক্ষ হেস্টির সহিত হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব লইয়া তাঁহার বাদানুবাদ হয় (স্টেট্স্ম্যান পত্রিকায়)।

১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দমঠ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হন। সেখানে আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েস্টমেকট্ সাহেবেব সহিত তাঁহার খিটি-মিটি বাধে। এই বিবাদের ফলে বঙ্কিমকে হয়তো চাকুরি ত্যাগ করিতে হইত, কিন্তু ওয়েস্টমেকট্ বদলি হওয়াতে তাহা করিতে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়, তিনি প্রথমে সেখান হইতে হাবড়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পরে বাধ্য হইয়া হাবড়ায় বাঁড়ি ভাড়া করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত বঙ্কিম হাবড়ায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' ও 'দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'দেবী চৌধুবাণী' 'বঙ্গদর্শনে' সমাপ্ত না হইতেই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হয়—সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় তাহা আর নিয়মিত বাহির হইতেছিল না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্য্যন্ত (১২৮৯, চৈত্র, নবম বৎসর সম্পূর্ণ) কোনও প্রকারে বাহির হইয়া 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়া যায়। তখন চন্দ্রনাথ

বসুর উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন; বউবাজার স্ট্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক হন। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক হইতে (১৮৮৩ অক্টোবর) 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হইয়া মাঘ মাসে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে তখনও 'বঙ্গদর্শনে'র উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়, নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে তাহা স্পষ্ট হইতেছে। ইহা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক সঞ্জীবচন্দ্রকে লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীচরণেষু,

অঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখিবেন, যে মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে আপত্তি নাই, ভবিষ্যৎ সংখ্যার প্রতি আপত্তি আছে। অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা ভিন্ন আর বাহির করিতে দিবেন না। ইহা লিখিবেন।

পত্র পাঠ মাত্র ইহা লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতেছে। কিন্তু এটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না।

ইতি তাং ২৩ ফিব্রুয়ারি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ বসুর চেষ্টাতেও 'বঙ্গদর্শন' আর পুনঃপ্রকাশিত হয় নাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে 'প্রচার' প্রচারিত হয়। ইহার ঠিক ১৫ দিন পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রিকার প্রকাশ সুরু হয়। *

---

* "নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।"—বঙ্কিমচন্দ্র

'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হইতে থাকে, 'ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলনে'র প্রবন্ধগুলি 'নবজীবনে' বাহির হয়। এই দুই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র প্রথম বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে সে সময় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন হইয়াছিল। এই তর্কের ফলে বঙ্কিমের মতামতগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনীর আড়ালে থাকিয়া যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কৈলাস-চন্দ্র সিংহ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথ বসু এই যুদ্ধে বঙ্কিমের পক্ষে ছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হওয়া পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্রকে ঝিনিদহ (যশোহর), ভদ্রক (কটক), হাবড়া ও মেদিনীপুর ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। এই ৩২ মাস সময়ের মধ্যে ১৩ মাস তিনি অসুস্থতাবশতঃ ছুটিতে কাটাইয়াছেন। তিনি হাঁপানিতে এই কালে খুব ভুগিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে 'প্রচারে' তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' ও 'রাজসিংহ' একত্র 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' নামে বাহির হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ। ১ম ভাগ' তাঁহার সম্পাদনায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তল্লিখিত 'জীবন চরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ' সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র দ্বিতীয় পরিবর্ত্তিত সংস্করণ 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সীতারাম' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ' পুস্তকাকারে বাহির হয়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখস্থ প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিতে একটি বাটী খরিদ করিয়া সেখানেই বাস কবিতে থাকেন। তখন তিনি হাবড়ায় ডেপুটি ছিলেন; ১৮৮৭ সনের মে মাসে তিনি মেদিনীপুব যান। তৎপূর্ব্বে ৬ মাসের ছুটি লইয়া তিনি বিশ্রাম ও হৃতস্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা কবেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেব ৯ই মার্চ তারিখে তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর-ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। মির্জ্জাপুর, বিন্ধ্যাচল, কাশী, আগ্রা হইযা তাঁহাবা মথুবা-বৃন্দাবন অবধি গিয়াছিলেন। মথুরায় জ্যেষ্ঠেব সহিত সঞ্জীব ও বঙ্কিমের মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি একা জয়পুর চলিয়া যান। বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদে ফিবিযা আসেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ তারিখেব সন্ধ্যায় এলাহাবাদের খসরুবাগে তাঁহাকে লইযা একটি সাহিত্য-সভা হয। ২রা এপ্রিল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'প্রচার' পত্রিকায় এই সময় তাঁহার 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশিত হইতে থাকে—ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ, ১৮৮৮ সনের মার্চ মাসে 'প্রচার' বন্ধ হয।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর হইতে বঙ্কিম আলিপুরে বদলি হন। কলিকাতার বাড়ি হইতেই তিনি আলিপুর যাতায়াত করিতেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চাকুরি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৮৮ সনে তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' প্রকাশিত হয়।

চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতাতেই অবস্থান করেন।

এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত নূতন অথবা পরিবর্দ্ধিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কবিতা-পুস্তক' দ্বিতীয় সংস্করণ 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামে —১৮৯১

'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় ভাগ—১৮৯২

'কৃষ্ণচরিত্র', ২য় সংস্করণ—১৮৯২

'ইন্দিরা', ৫ম সংস্করণ—১৮৯৩

'রাধারাণী' ৪র্থ সংস্করণ—১৮৯৩

'রাজসিংহ' ৪র্থ সংস্করণ—১৮৯৩

তাঁহার 'সহজ রচনা শিক্ষা' ও 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' এই কালেই প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'Bengali Selections' প্রকাশ করেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'লুপ্ত-রত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন, এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনী-সুধা' নাম দিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সঙ্কলন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী সহ প্রকাশ করেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রায় বাহাদুর ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী

অ্যাসোসিয়শনে "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য় বাহির হয়। প্রবন্ধটি পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্র অংশতঃ ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথের টিপ্পনী সমেত প্রকাশিত হয়। সেই অংশ এই—

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। ঐ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"—কিন্তু কেন যে তাঁহার ক্ষীণস্বর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মহতী সভা "অসংখ্যবালক-বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে" কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণস্বর যদি বা কর্ণ ভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষ্ণবাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তারিখে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামীয় সভার প্রতিষ্ঠা-দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই সভার নাম পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তি—উক্ত সভার উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্য বিষয়ক ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা, এই বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে'র ঐ বৎসরের গোড়ার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার বহুমূত্র

রোগ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পায়, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন কিন্তু বাক্‌রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র বেলা তিনটার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

বঙ্কিমের পুত্রসন্তান হয় নাই, তিনটি কন্যা জন্মিয়াছিল—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। তাঁহারা কেহই এখন বর্ত্তমান নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে। জার্মান, সোয়েডিশ ও ভারতীয় বহু ভাষাতেও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির তালিকা করা সম্ভব নয়। বঙ্কিমের জীবিত-কালে যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হয়—ইংরেজী 'কপালকুণ্ডলা', National Magazine Calcutta, 1876-77, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'—চারুচন্দ্র মুখার্জি, Calcutta, 1880, 'বিষবৃক্ষ'—Miriam S. Knight, London, 1884; 'কপালকুণ্ডলা'—H. A. D. Phillips, London, 1885; জার্মান—'কপালকুণ্ডলা'—Curt Klemm, Leipzig, 1886; হিন্দুস্থানী—'দুর্গেশনন্দিনী'—K. Krishnam, Lucknow, 1876; 'মৃণালিনী'—K. Simham, Lucknow, 1880; 'বিষবৃক্ষ'—G. Quadir, Silakot, 1891; 'দেবী চৌধুরাণী'—Tulasi Rama, Amritsar, 1893; হিন্দী—'যুগলাঙ্গুরীয়'—K. R. Bhatt, Patna, 1880; 'দুর্গেশনন্দিনী'—G. Simha, Benares, 1882; কানাড়ী—'দুর্গেশনন্দিনী', Bangalore, 1885.

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টক্‌হল্‌ম হইতে 'বিষবৃক্ষে'র সোয়েডিশ অনুবাদ

'Det giftiga Tradet' নামে প্রকাশিত হয়। ইহা বঙ্কিমের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও হইতে পারে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জে. এফ. ব্রাউন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্পূর্ণ রোমান হরফে মুদ্রিত করেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে হইতে ন্যাশনাল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হইতে সুরু হয়। প্রথম দিন 'কপাল-কুণ্ডলা' অভিনীত হইয়াছিল। পরে পরে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী' মায় 'কমলাকান্ত' পর্য্যন্ত বঙ্কিমের যাবতীয় উপন্যাস ও গল্প অভিনীত হইয়াছে।

Hunter's Statistical Account of Bengal' পুস্তকের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র Land Tenures ইত্যাদি বিষয়ক উপাদান জোগাইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐরূপ কোনও পুস্তকের জন্য তিনি 'Caste in Lower Bengal নামে একটি প্রবন্ধও রচনা করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পরে ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি 'Letters on Hinduism' রচনা করেন। শেষোক্ত লেখা দুইটি পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর অনুগ্রহে আমরা ভূদেবকে লিখিত বঙ্কিমের একটি বাংলা ও দুইটি ইংরেজী পত্রের নকল পাইয়াছি। পত্র তিনখানি নানা দিক দিয়া মূল্যবান। ইংরেজী পত্র দুইটি বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যাজপুরে অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন। বাংলা পত্রটি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন লিখিত; বঙ্কিমচন্দ্র তখন মেদিনীপুরে বদলি হইয়াছেন, এবং কলিকাতায় প্রতাপ চাটুজ্জের গলির বাড়ি সবে খরিদ করা হইয়াছে, পত্রটি সেই বাড়ি হইতে লিখিত।

৫নং প্রতাপ চাটুয্যার গলি
কলিকাতা—১৩ জুন

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়াছি। আমার পুস্তক গুলি আপনি নিজে ষ্টেশনে আসিয়া লইয়া গিয়াছেন, এবং অনুরুদ্ধ না হইয়াও পড়িয়া থাকেন, ইহার অপেক্ষা পুস্তকের আদর আর কি বেশী হইতে পারে? ইহাই আমার আশার অতীত ফল।

পুস্তক গুলি যে রূপ বাজারে বিক্রয় হয়, সেই রূপ বাঁধানই আপনাকে পাঠান হইয়াছে, ভাল করিয়া বাঁধান হয় নাই। সকল গুলি, এক রকম বাঁধান, এবং বাঁধান ইহার অপেক্ষা ভাল হয়, এই রূপ করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঁধান পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে, ছোট মার্জিন আরও ছাঁটা পড়িয়া যাইবে, এবং আবাঁধা পুস্তক

এক সেট পুরা হয় না, এজন্য যেমন ছিল, তেমনি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গ্রন্থেরও একটু বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তক গুলি সোণার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।

গীতা পুনশ্চ প্রচারে প্রকাশিত হইতেছে।* যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে পাঠাইতে পারি। উহাতে আপনার দেখিবার যোগ্য কিছু নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তবে, আমরা কি ভাবি, কি করি, ইহা বোধ হয়, দেখিতে আপনাব ইচ্ছা হইতে পারে। ইতি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায

২

Jajpur, Camp Burchora
November 13/82

My dear Bhudeb Babu

I have received the পারিবারিক প্রবন্ধ. I should perhaps earlier have acknowledged the very kind words with which the present was accompanied, but I believe no thanks I could send would have been acceptable to you unless I could also send you my assurance that I have read through the book in 48 hours. I can say so now.

I write all this without any scruple because although the publication is anonymous, I believe you do not wish to keep the authorship a secret from me, and you would take me for a greater blockhead than I am if I pretended that I did not guess it. There is only one hand which could have produced the work ; and the whole public is probably aware whose it is.

* ইহার অব্যবহিত পরে 'প্রচার' বন্ধ হইয়া যায়।

I take this opportunity of confessing to you—what perhaps few others will venture to tell you—that I have often felt hurt by your withholding your name from your writings. It has seemed to you that you feel reluctant to lend the honor of your name to such a thing as Vernacular Literature. In the the present case the book rightly comes without a name. The most devout worship is that which is performed in secret. The whole book is one grand hymn to the holiest of human affections, and is best sung by an invisible chorister.

The highest poetry is also the highest practical wisdom—the poetry of Real Life. There is more practical wisdom in Shakespeare's plays than in Bacon's Essays—or in any other English writings whatever. Many of my educated countrymen have no hesitation in admitting this as an abstract proposition, but very few of them realise it in life. I believe your little volume will enable many of them to do so, if they will resort to its pages. But most of them think it *infra-dig.* to go to a Bengali Book for instruction, even though that book be your writing.

I hope you will now do for our Social Life what you have done for our Domestic Life. The Social life presents the more unmanageable problem of the two. The inherent excellence of our domestic institutions, and the true greatness of our women preserve our domestic life from disintegration. *

Yours affly.
Bunkim Ch. Chatterji.

৩

Byree, Jajpur
The 22nd Nov.

My dear Bhudeb Baboo

I shall be happy to send you some notes of my feelings—I cannot call them thoughts—on the various social

* ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ'ও ইহার পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

problems before us. But may I ask you what is the plan on which you propose to deal with the social questions— if you deal with them ? I make the enquiry, because a knowledge of your plan may help me to explain myself better than I can without it Social life is far more complicated than domestic life ; and its aspects are so multifarious,—so numerous are the questions it presents for solution, that I do not think that either you or any other individual writer, can undertake its exhaustive treatment—You have therefore I dare say formed some plan, or intend to form some plan with the aid of which you propose to thread the labyrinth—some map or chart of the regions you propose to traverse. If I get a glimpse into that chart, I may be able to judge how far and in what manner I can follow you In the meantime I will try to jot down a few notes regarding what is uppermost in my mind.

I had not space enough in my last letter to write of the delight with which I found that the পারিবারিক প্রবন্ধ had been written in a style suited to all, and the price low enough to be within the means of most This will I hope enable the book to find its way, as it ought to do, into every household where there are readers. It enables a man to make his life sweeter to himself and to others at the cost of eight annas only.

I hope Nyayratna * remembers me. I have not ceased to love and esteem his sweet character

Yours very sincerely
Bunkim Ch. Chatterji

* রামগতি ন্যায়রত্ন।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিম-জন্মশত-বার্ষিক উপলক্ষে
১০ই আষাঢ় ১৩৪৫ তারিখে পঠিত)

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি',
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পূরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।

তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্ত্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

DWARKIN'S HARMONIUMS

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়াকিনের হারমোনিয়মই আপনার কেনা উচিত। ডোয়াকিনই হাত-হারমোনিয়মের আবিষ্কারক এবং এই যন্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি এ যাবৎ হইয়াছে তাহা ডোয়াকিনের বাড়ী থেকেই উদ্ভূত।

বাজারের জিনিষ ২।৪ টাকা কম দামে অবশ্য পাইতে পারেন কিন্তু তাহা ডোয়াকিনের জিনিষের মত নির্ভরযোগ্য কখনই হইতে পারে না।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

DWARKIN & SON, 11, Esplanade, Calcutta.

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত